থাকিলেই বা কি হইবে, যেমন খিজির (আঃ) সেকান্দর বাদশাকে আবে হায়াতের নিকট হইতে পিপাসার্ত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

কত সৌভাগ্যবান ঐ সকল মাশায়েখ যাহারা এই কথা বলিতে পারেন যে, বালেগ হওয়ার পর হইতে আমার কখনও শবে কদরের এবাদত ছুটে নাই। তবে এই মুবারক রাত্র ঠিক কোন্‌টি? এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দীর্ঘ মত-পার্থক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশটি অভিমত আছে। সবগুলির আলোচনা করা খুবই কঠিন। শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ অভিমতগুলির আলোচনা সামনে আসিতেছে। হাদীসের কিতাবসমূহে এই রাত্রির বিভিন্ন রকমের ফযীলত সম্বলিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। উহারও কিছু কিছু এখানে পেশ করা হইবে। কিন্তু এই রাত্রির ফযীলত যেহেতু স্বয়ং কুরআনে পাকে উল্লেখিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে একটি পৃথক সূরাও নাযিল হইয়াছে, কাজেই প্রথমে এই সূরার তফসীর লিখিয়া দেওয়া উত্তম মনে হইতেছে। আয়াতের অর্থ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর 'তফসীরে বয়ানুল কুরআন' হইতে এবং ফায়দাসমূহ অন্যান্য কিতাব হইতে লওয়া হইয়াছে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি এই কুরআনকে কদরের রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি। (সূরা কদর, আয়াত ঃ ১)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কুরআনে পাক লওহে মাহফূজ হইতে এই রাত্রিতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই একটি মাত্র বিষয়ই এই রাত্রির ফযীলতের জন্য যথেষ্ট ছিল যে, কুরআনের ন্যায় এমন মহামর্যাদাশীল জিনিসও এই রাত্রিতে নাযিল হইয়াছে। তদুপরি ইহার সহিত আরও বহু বরকত ও ফযীলতও শামিল রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই রাত্রির প্রতি শওক ও আগ্রহ আরও বাড়াইবার জন্য এরশাদ করিতেছেন—

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

আপনি কি জানেন শবে কদর কত বড় জিনিস? (সূরা কদর, আয়াতঃ ২)

অর্থাৎ, এই রাত্রের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আপনার কি জানা আছে যে, ইহার মধ্যে কত গুণ-গরিমা ও কি পরিমাণ ফাযায়েল রহিয়াছে! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই কয়েকটি ফাযায়েল উল্লেখ করেন।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

শবে কদর হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৩)

অর্থাৎ হাজার মাস এবাদত করিলে যে পরিমাণ সওয়াব হইবে এক শবে কদরে এবাদত করিলে উহার চাইতেও বেশী সওয়াব হাসিল হইবে। আর এই বেশী যে কত বেশী তাহা কাহারও জানা নাই।

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ

'এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন।' (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৪)

আল্লামা রাযী (রহঃ) লিখেন যে, ফেরেশতারা সৃষ্টির শুরুতে যখন তোমাকে দেখিয়াছিল, তখন তোমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিল যে, আপনি এমন এক জিনিস সৃষ্টি করিতেছেন যাহারা দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও রক্তপাত করিবে। অতঃপর যখন পিতামাতা বীর্যের আকারে প্রথম দেখিয়াছিল তখন তোমাকে ঘৃণা করিয়াছিল, এমনকি যদি তাহা কাপড়ে লাগিয়া যাইত তবে ধুইয়া ফেলিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন এই বীর্য-ফোটাকে উত্তম আকৃতি দান করিলেন তখন পিতামাতাও তাহাকে স্নেহ ও পেয়ার করিতে লাগিল। তদ্রূপ, আজ যখন তুমি আল্লাহর তওফীকে পুণ্যময় শবে কদরে আল্লাহর মারেফাত ও এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়াছ তখন ফেরেশতারাও তাহাদের পূর্বেকার মন্তব্যের ওজর পেশ করিতে দুনিয়াতে অবতরণ করে।

وَالرُّوحُ فِيهَا

'এবং এই রাত্রিতে রূহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও অবতরণ করেন।' (সূরা কদর, আয়াত ঃ ৪)

রূহ শব্দের অর্থ কি? এই সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত উহাই যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ রূহ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা রাযী (রহঃ) এই অভিমতকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই ফেরেশতাদেরকে উল্লেখ করিবার পর খাছভাবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেক বড় একজন ফেরেশতা, যাহার নিকট সমস্ত আসমান যমীন একটি লোকমার সমান। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রূহ দ্বারা ফেরেশতাদের একটি খাছ জামাতকে বুঝানো হইয়াছে যাহাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণও শুধু শবে কদরেই দেখিয়া থাকেন। চতুর্থ অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কোন খাছ মখলুককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা খানাপিনা করেন ; কিন্তু

ফেরেশতাও নহেন মানুষও নহেন। পঞ্চম অভিমত হইল এই যে, রূহ দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। তিনি উম্মতে মুহম্মদীর এবাদত বন্দেগী দেখিবার জন্য ফেরেশতাদের সহিত অবতরণ করেন। ষষ্ঠ অভিমত হইল, রূহ্ আল্লাহ তায়ালার একটি খাছ রহমত। অর্থাৎ, এই রাত্রে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন এবং তাহাদের পর আল্লাহ তায়ালার খাছ রহমত নাযিল হয়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

'সুনানে বায়হাকী' কিতাবে হযরত আনাস (রাযিঃ)এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের একটি দলের সহিত অবতরণ করেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে যিকির বা অন্যান্য এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল দেখিতে পান, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন।

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদিগারের হুকুমে প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর বিষয় লইয়া জমিনের দিকে অবতরণ করেন। (সূরা কদর ঃ ৪)

'মাযাহিরে হক' কিতাবে আছে, এই কদরের রাত্রেই ফেরেশতাদের জন্ম হইয়াছে এবং এই রাত্রেই হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি উপাদানসমূহ জমা হইতে শুরু হইয়াছে। এই রাত্রেই জান্নাতে গাছ লাগানো হইয়াছে। আর এই রাত্রে অত্যধিক পরিমাণে দোয়া ইত্যাদি কবুল হওয়া তো অনেক রেওয়ায়াতেই আসিয়াছে। 'দুররে মানসূরে'র এক রেওয়ায়াতে আছে, এই রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠান হইয়াছে এবং এই রাত্রেই বনী ইসরাঈল গোত্রের তওবা কবূল হইয়াছে।

سَلَامٌ

'এই রাত্রটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সালাম ও শান্তি।'

অর্থাৎ সারা রাত্র ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে মুমিনদের উপর সালাম বর্ষিত হইতে থাকে। কারণ, রাত্রভর ফেরেশতাদের এক জামাআত আসিতে থাকে এবং অপর জামাত যাইতে থাকে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে এইভাবে ফেরেশতাদের একের পর এক জামাআত আসা–যাওয়ার কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, এই রাত্রটি পরিপূর্ণরূপে শান্তিময় ; যে কোন ফেৎনা–ফাসাদ ইত্যাদি হইতে নিরাপদ।

هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

'এই রাত্র (উল্লেখিত বরকতসমূহ সহ) সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকে।'

(সূরা কদর, আয়াত ঃ ৫)

এমন নয় যে, এই বরকত রাত্রের কোন বিশেষ অংশে থাকে আর অন্যান্য অংশে থাকে না, বরং সমানভাবে সকাল পর্যন্তই এই বরকতসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। এই পবিত্র সূরার আলোচনার পর যাহাতে স্বয়ং আল্লাহ পাক এই রাত্রের কয়েক প্রকার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা এরশাদ করিয়াছেন আর হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু হাদীস শরীফেও এই রাত্রের বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ঐ সমস্ত হাদীস হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হইতেছে।

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (كذا في الترغيب عن البخاري ومسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کیلئے) کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের নিয়তে এবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

ফায়দা ঃ দাঁড়াইবার অর্থ হইল, সে নামায পড়ে। অনুরূপভাবে অন্যান্য এবাদত যেমন তেলাওয়াত যিকির ইত্যাদি এবাদতে মশগুল হওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। সওয়াবের নিয়ত ও আশা রাখিবার অর্থ হইল, রিয়া অর্থাৎ মানুষকে দেখান বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে না দাঁড়ায়। বরং এখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহকে রাজী–খুশী করা ও সওয়াব হাসিল করার নিয়তে দাঁড়াইবে। খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, বুঝিয়া শুনিয়া সওয়াবের একীন করিয়া মনের আনন্দ ও শওকের সহিত দাঁড়াইবে। বোঝা মনে করিয়া মনের অনিচ্ছায় নয়। আর ইহা তো স্পষ্ট কথা যে, সওয়াবের একীন যত বেশী হইবে এবাদতে কষ্ট সহ্য করা ততই সহজ হইবে। এই কারণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে যে যত বেশী তরক্কী করিতে থাকে এবাদত–বন্দেগীতে তাহার মগ্নতা ততই বাড়িয়া যায়।

এখানে এই কথাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, উপরোল্লিখিত হাদীস বা অন্যান্য যেসব হাদীসে গোনাহ মাফের কথা বলা হইয়াছে, ওলামায়ে কেরামের মতে উহার দ্বারা সগীরা গোনাহকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা কুরআন পাকে যেখানে কবীরা গোনাহের কথা আসিয়াছে সেখানেই إِلَّا مَنْ تَابَ অর্থাৎ, 'তবে যাহারা তওবা করে' এই বাক্যসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হইল, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। সুতরাং হাদীস শরীফে যেখানেই গোনাহ মাফের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামায়ে কেরাম সেই গোনাহগুলিকে সগীরা গোনাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমার আব্বাজান (রহঃ) বলিতেন, হাদীস শরীফে গোনাহ দ্বারা সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও সগীরা গোনাহের কথা দুই কারণে উল্লেখ করা হয় না। প্রথমতঃ মুসলমানের এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না যে, তাহার উপর কবীরা গোনাহের কোন বোঝা থাকিতে পারে। কেননা, তাহার দ্বারা কোন কবীরা গোনাহ হইয়া গেলে তওবা না করা পর্যন্ত সে স্থির হইতেই পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ যখন শবে কদরের মত এবাদতের বিশেষ কোন সুযোগ আসে মুসলমান সওয়াবের নিয়তে এবাদত–বন্দেগী করে তখন প্রকৃত মুসলমান নিজের বদআমলসমূহের জন্য অবশ্যই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এইভাবে আপনা আপনিই তাহার তওবা হইয়া যায়। কেননা বিগত গোনাহসমুহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার পাকা এরাদা ও দৃঢ় অঙ্গীকার করার নামই হইল তওবা। সুতরাং যদি কাহারও দ্বারা কবীরা গোনাহ হইয়া যায় তবে জরুরী হইল, শবে কদর বা দোয়া কবূলের অন্য কোন সময়ে নিজের গোনাহসমূহের জন্য মনে প্রাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আন্তরিক ও মৌখিকভাবে তওবা করিয়া নেওয়া। যাহাতে আল্লাহ তায়ালার পুরাপুরি রহমত তাহার উপর বর্ষিত হয় এবং সগীরা ও কবীরা সকল প্রকার গোনাহ মাফ হইয়া যায়। যদি স্মরণ আসিয়া যায় তবে অধম গোনাহগারকেও আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ায় শরীক করিবেন।

(২) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

حضرت انس رض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اُوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص

مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوْمٌ. (رواه ابن ماجة واسناده حسن انشاء الله كذا في الترغيب وفي المشكوٰة عنه الاكل محروم)

اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقۃً محروم ہی ہے

(২) হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমাদের নিকট একটি মাস আসিয়াছে। উহাতে একটি রাত্র আছে যাহা হাজার মাস হইতেও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত্র হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল সে যেন সমস্ত ভালাই ও কল্যাণ হইতে মাহরূম থাকিয়া গেল। আর এই রাত্রির কল্যাণ হইতে কেবল ঐ ব্যক্তিই মাহরূম থাকে যে প্রকৃতপক্ষেই মাহরূম।

(তারগীব ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এত বড় নেয়ামত নিজের হাতে ছাড়িয়া দেয় প্রকৃতপক্ষেই তাহার মাহরূম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। একজন রেল–কর্মচারী যদি কয়েকটি কড়ির জন্য সারারাত্র জাগিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে আশি বৎসরের এবাদতের জন্য একমাস রাত্র জাগিয়া থাকিলে অসুবিধার কি আছে? আসল কথা হইল দিলের মধ্যে সেই জ্বালা ও তাড়নাই নাই। তবে কোনক্রমে একটু স্বাদ পাইয়া গেলে এক রাত্র কেন শত শত রাত্রও জাগিয়া থাকা যায়।

اُلفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

'মহব্বতের জগতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও ভঙ্গ করা উভয় সমান। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই মজা পাওয়া যায় যদি অন্তরে মজা থাকে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ ও উচ্চ মর্যাদার ওয়াদা ছিল, যেগুলির প্রতি তাঁহার পুরাপুরি একীন থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এত লম্বা নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা মুবারক ফুলিয়া যাইত, নিশ্চয়ই ইহার কোন কারণ ছিল। আমরা তাঁহারই মহব্বতের দাবীদার হইয়া কি করিতেছি? তবে হাঁ, যাহারা এইসব বিষয়ের কদর করিয়াছেন তাঁহারা সবকিছুই করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরা নমুনা হইয়া উম্মতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। কাহারও এই কথা বলার আর সুযোগ থাকে নাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় এবাদত করার সাহস কে করিতে পারে আর কাহার দ্বারাই বা সম্ভব? আসলে মনে ধরার ব্যাপার, ইচ্ছা থাকিলে পাহাড় খুঁড়িয়াও দুধের নহর বাহির করা

মুশকিল নয়। কিন্তু এই জিনিস হাসিল হওয়া কাহারও জুতা সিধা করা ব্যতীত (অর্থাৎ কোন আল্লাহওয়ালার হাতে নিজেকে সোপর্দ করা ব্যতীত) খুবই মুশকিল।

تمنا دردِ دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

'অন্তরে দরদ হাসিল করিতে হইলে ফকীর-দরবেশ আল্লাহওয়ালাদের খেদমত কর, কেননা এই মহামূল্য মণিমুক্তা রাজা-বাদশার ভাণ্ডারেও পাইবে না।'

হযরত ওমর (রাযিঃ) কি কারণে এশার নামাযের পর বাড়িতে গিয়া সকাল পর্যন্ত নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) দিনভর রোযা রাখিতেন এবং সারারাত্র নামাযে কাটাইয়া দিতেন ; শুধু রাত্রের প্রথম অংশে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন। রাত্রে এক এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। 'শরহে এহইয়া' কিতাবে আবূ তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চল্লিশজন তাবেয়ী সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত আছে, যে, তাঁহারা এশার নামাযের ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়িতেন। হযরত শাদ্দাদ (রহঃ) রাত্রে শুইতেন আর এপাশ ওপাশ করিতে করিতে সকাল করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহ! আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে। হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) রমযান মাসে শুধু মাগরিব ও এশার মাঝখানে সামান্য সময় ঘুমাইতেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন। হযরত সিলাহ ইবনে আশয়াম (রহঃ) সারা রাত্র নামায পড়িতেন আর সকালে এই দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত চাহিবার যোগ্য তো নই। শুধু এতটুকু দরখাস্ত করিতেছি যে, আমাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া দিন। হযরত কাতাদা (রহঃ) পুরা রমযান মাসে প্রতি তিন রাত্রে কুরআন শরীফ এক খতম করিতেন। আর শেষ দশ দিন প্রতি রাত্রে এক খতম করিতেন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছেন, ইহা এত প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, ইহাকে অস্বীকার করিলে ইতিহাসের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি এই শক্তি কিভাবে অর্জন করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নামসমূহের তোফায়েলে এক বিশেষ তরিকায় দোয়া করিয়াছিলাম। ইমাম আবূ হানীফা

(রহঃ) শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময়ের জন্য শুইতেন ; তিনি বলিতেন, হাদীস শরীফে 'কায়লুলা' করার কথা এরশাদ হইয়াছে। বস্তুতঃ দুপুরে শোয়ার মধ্যেও সুন্নতের অনুসরণের নিয়ত থাকিত। কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় তিনি এত কাঁদিতেন যে, প্রতিবেশীদেরও দয়া আসিয়া যাইত। একবার بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ الخ এই আয়াত পড়িতে পড়িতে সারারাত্র কাঁদিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) রমযান মাসে রাত্রেও ঘুমাইতেন না এবং দিনেও ঘুমাইতেন না। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) পুরা রমযান মাসে দিবা-রাত্রির নামাযে ষাটবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। এইগুলি ছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীনের আরও শত শত ঘটনা রহিয়াছে। তাহারা আল্লাহর বাণী 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি' ইহার অর্থকে সত্যে পরিণত করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা এবাদত করিতে চায় তাহাদের জন্য এইরূপ এবাদত করা কোন মুশকিল নয়। এই হইল আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ঘটনাবলী। তবে এবাদতকারী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ববর্তীদের মত মুজাহাদা না হউক ; কিন্তু নিজেদের যমানা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নমুনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার অনুসরণকারীদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহাদের জন্য আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা কোনটাই তাহাদের এবাদতের মগ্নতায় বাধা হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতায় ভরিয়া দিব, তোমার অভাব-অনটন দূর করিয়া দিব। নতুবা তোমার অন্তরকে বিভিন্ন ব্যস্ততার দ্বারা ভরপুর করিয়া দিব এবং তোমার অভাব-অনটনও দূর হইবে না।' প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনাবলী এই সত্য বাণীর সাক্ষ্য দিতেছে।

(٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرئیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کیلئے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے (اور عبادت میں مشغول ہے) دعائے رحمت

يَذْكُرُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ
بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهٗ فَقَالَ
يَا مَلَائِكَتِيْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى
عَمَلَهٗ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى
اَجْرُهٗ قَالَ مَلَائِكَتِيْ عَبِيْدِيْ
وَاِمَائِيْ قَضَوْا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَآءِ
وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ
وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ
ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ
سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ
مَغْفُوْرًا لَّهُمْ۔ (رواه البيهقى فى شعب
الايمان كذا فى المشكوٰة)

عہ بالنصب وقیل بالرفع کذا فی المرقات ۱۲

کرتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے
تو حق تعالیٰ جَلّ شانُہٗ اپنے فرشتوں کے سامنے
بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں (اسلیئے
کہ اُنہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا) اور اُن
سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو اس
مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے
کیا بدلہ ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے
ربّ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اُس کی اُجرت
پوری دیدی جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو!
میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے
فریضہ کو پورا کر دیا پھر دعا کے ساتھ چلّاتے
ہوئے (عیدگاہ کی طرف) نکلے ہیں میری
عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری
بخشش کی قسم میرے عُلُوِّ شان کی قسم میرے
بلندیٔ مرتبہ کی قسم میں ان لوگوں کی دُعا ضرور
قبول کروں گا پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمھارے
گناہ معاف کر دیئے ہیں اور تمھاری بُرائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے پس یہ
لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو
چکے ہوتے ہیں۔

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, শবে কদরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের একটি জামাতের সহিত অবতরণ করেন। যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আল্লাহর যিকির করিতে থাকে বা এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের দিন হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে বান্দাদের এবাদত-বন্দেগী লইয়া গর্ব করেন। কেননা, ফেরেশতারা মানুষকে দোষারোপ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন—হে ফেরেশতারা! যে মজদুর

নিজ দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করিয়া দেয় তাহার বদলা কি হইতে পারে? ফেরেশতারা আরজ করেন, হে আমাদের রব্ব! তাহার বদলা এই যে, তাহাকে পুরা পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে ফেরেশতারা! আমার বান্দা ও বান্দীগণ আমার দেওয়া ফরয হুকুমকে পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছে, এখন উচ্চস্বরে দোয়া করিতে করিতে ঈদগাহের দিকে যাইতেছে। আমার ইয্যতের কসম, আমার প্রতাপের কসম, আমার বখশিশের কসম, আমার সুমহান শানের কসম, আমার সুউচ্চ মর্যাদার কসম, আমি তাহাদের দোয়া অবশ্যই কবূল করিব। তারপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, যাও আমি তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের গোনাহগুলিকে নেকীর দ্বারা বদলাইয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা ঈদগাহ হইতে নিষ্পাপ হইয়া ফিরিয়া আসে। (মিশকাত ঃ বাইহাকী ঃ শুআব)

ফায়দা ঃ ফেরেশতাদের সহিত হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর আগমন স্বয়ং কুরআনে পাকেও উল্লেখিত হইয়াছে, যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। বহু হাদীসেও ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিতাবের সর্বশেষ হাদীসেও এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদেরকে তাগাদা করিয়া প্রত্যেক এবাদতকারী লোকের ঘরে ঘরে যাইতে এবং তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিতে বলেন।

'গালিয়াতুল মাওয়ায়েজ' কিতাবে হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)এর 'গুনিয়া' কিতাব হইতে নকল করা হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর হাদীসে আছে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর এই তাগাদা দেওয়ার পর ফেরেশতাগণ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং যে কোন ঘর বা ছোট বড়, ময়দান এমনকি পানির উপরে নৌকায় আল্লাহর কোন মুমিন বান্দা থাকেন ফেরেশতারা তাহাদের সহিত মুসাফাহা করিতে যান। কিন্তু যেসব ঘরে কুকুর, শূকর, জীবজন্তুর ফটো লটকানো থাকে এবং হারাম কাজে গোসল ফরয হইয়াছে এমন লোক থাকে সেইসব ঘরে প্রবেশ করেন না। মুসলমানদের বহু ঘর এমন রহিয়াছে, যেখানে শুধু সৌন্দর্যের জন্য তাহারা প্রাণীর ফটো টানাইয়া রাখে এবং আল্লাহর এত বড় রহমত ও নেয়ামত হইতে নিজ হাতেই নিজেদের বঞ্চিত রাখে। ছবি হয়ত দুই একজনেই টানাইয়া থাকে কিন্তু ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণে সে নিজের সহিত, ঘরের সকলকেও রহমত ও নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখে।

(۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (مشکوٰۃ عن البخاری)

حضرت عائشہ رضؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা রমযান মুবারকের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস ২৯ দিনে হউক বা ৩০ দিনে হউক শেষ দশ দিন একুশতম রাত্র হইতে শুরু হয়। এই হিসাবে উল্লেখিত হাদীস মুতাবিক শবে কদর ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের রাত্রগুলিতে তালাশ করা উচিত। যদি মাস ২৯ দিনেই হয় তবুও এই দিনগুলিকেই শেষ দশদিন বলা হইবে। কিন্তু আল্লামা ইবনে হায্‌ম (রহঃ) বলেন, 'আশারা' শব্দের অর্থ হইল দশ। সুতরাং রমযানের চাঁদ যদি ত্রিশা হয় তবে তো একুশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত দিনগুলিকে শেষ দশ দিন বলা হইবে। কিন্তু চাঁদ যদি ঊনত্রিশা হয় তবে শেষ দশ দিন বিশতম রাত্রি হইতে শুরু হইবে। এই হিসাবে বেজোড় রাত্রি হইবে ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের তালাশে রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। আর এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, উহা একুশতম রাত্রি হইতে শুরু হইত। এইজন্য অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে একুশতম রাত্র হইতে বেজোড় রাত্রগুলিতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ও অধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। অবশ্য অন্যান্য রাত্রগুলিতেও শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই উভয় উক্তি অনুযায়ী শবে কদরের তালাশ তখনই সম্ভব হইবে যখন ২০তম রাত্র হইতে ঈদের রাত্র পর্যন্ত প্রতিটি রাত্র জাগিয়া থাকিয়া শবে কদরের ফিকিরে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি শবে কদরের সওয়াবের আশা রাখে তাহার জন্য মাত্র দশ এগারটি রাত্র জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়া দেওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

عُرفی اگر بگریہ مُیسّر شدے وصال   صد سال میتواں بہ تمنّا گریستن

অর্থ ঃ হে উরফী ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি বন্ধুর মিলন লাভ হয় তবে এই

আশায় শত বৎসরও কাঁদিয়া কাটানো যায়।

(۵) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضؓ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (مشکوٰۃ عن البخاری)

حضرت عُبادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسلئے آیا تھا کہ تمھیں شب قدر کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اُٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اُٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو لہٰذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

(৫) হযরত উবাদা (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ জানাইবার জন্য বাহিরে তাশরীফ আনিলেন। এই সময় দুইজন মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, আমি তোমাদিগকে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইতেছিল বিধায় নির্দিষ্ট তারিখ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। হয়ত এই উঠাইয়া লওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কোন মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রগুলিতে শবে কদর তালাশ কর। (মিশকাত ঃ বুখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—সর্বপ্রথম যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, ঝগড়া কত বড় অনিষ্টকর যে, ইহার জন্যই শবে কদরের তারিখ চিরদিনের জন্য উঠাইয়া লওয়া হইল। শুধু ইহাই নয় বরং ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই বরকত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদি হইতেও উত্তম জিনিস বলিয়া দিব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন—অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পরস্পর সদ্ব্যবহার সবচাইতে উত্তম জিনিস। আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদ

দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া দেয় অর্থাৎ ক্ষুর দ্বারা যেমন মাথার চুল সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হইয়া যায়, তেমনিভাবে পারস্পর ঝগড়া-বিবাদের দ্বারা দ্বীনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় হইল, দ্বীন সম্পর্কে বেখবর অর্থাৎ দুনিয়াদার লোকদের কথা বাদই দিলাম বহু লম্বা লম্বা তসবীহ পাঠকারী, দ্বীনদারীর দাবীদার লোকেরাও সর্বদা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকে। তাই প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন অতঃপর নিজের সেই দ্বীনদারীর বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহার অহংকারে (এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে) ঝগড়া মিটাইবার জন্য নত হওয়ার তওফীক হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে রোযার আদবের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের ইয্যত নষ্ট করাকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য সুদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন তুমুল ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত যে, না কোন মুসলমানের ইয্যত-সম্মানের খাতির করি, না আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর কোন পরওয়া করি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا الاية অর্থাৎ তোমরা পরস্পর কলহ-বিবাদ করিও না। অন্যথা হিম্মতহারা হইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৪৬) যাহারা সবসময় অপরের ইযযত নষ্ট করার চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহাদের একটু নিরবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, ইহার দ্বারা তাহারা স্বয়ং নিজেদের মান-সম্মানের উপর কত বড় আঘাত হানিতেছে। উপরন্তু নিজেদের এই নাপাক ও নিকৃষ্ট কর্মের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে কত অপদস্থ হইতেছে ; ইহা ছাড়া দুনিয়ার যিল্লতি তো আছেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে আর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে সোজা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দাদের আমল পেশ করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বারা (নেক আমলসমূহের বদৌলতে) মুশরিক ব্যতীত অন্যদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থাকে তাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হয় যে, তাহাদের পরস্পর সন্ধি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখ। অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয়। এই সময় তওবাকারীদের তওবা ও

এস্তেগফারকারীদের এস্তেগফার কবূল করা হয়। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া-কলহকারীদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক হাদীসে আছে, শবে বরাতে আল্লাহ তায়ালার রহমত ব্যাপকভাবে সকলের দিকে রুজু হয় এবং সামান্য সামান্য বাহানায় ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না—এক. কাফের, দুই. যে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের নামায কবূল হওয়ার জন্য তাহাদের মাথার আধা হাত উপরেও উঠে না। তন্মধ্যে তাহাদের পরস্পর কলহ-বিবাদকারীদের কথাও বলিয়াছেন।

এখানে এই বিষয়ের সমস্ত হাদীস একত্র করার অবকাশ নাই। তবে কিছু হাদীস এইজন্য উল্লেখ করা হইল যে, বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো বটেই বরং যাহারা খাছ লোক, যাহাদেরকে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলা হয় এবং দ্বীনদার মনে করা হয় তাহাদের মজলিস, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিও এই হীনকর্ম দ্বারা ভরপুর থাকে। আল্লাহর দরবারেই অভিযোগ করি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখানে আরও একটি কথা জানা দরকার যে, এইসব ঝগড়া-বিবাদ ও দুশমনী তখনই নিন্দিত হইবে যখন উহা দুনিয়ার জন্য হইবে। আর যদি কাহারও গোনাহের কারণে কিংবা কোন দ্বীনী কাজের খাতিরে কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে উহা জায়েয আছে। একবার হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তাঁহার ছেলে এমন একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ হাদীসের উপর আপত্তি মনে হইতেছিল। এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) মৃত্যু পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর জীবনে এই ধরনের আরও বহু ঘটনা পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন-দেখেন, তিনি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, কে দ্বীনের খাতিরে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে আর কে নিজের অহংকার ও বড়াই প্রকাশের জন্য করিয়াছে। নতুবা প্রত্যেকেই দ্বীনের খাতিরে দুশমনী করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে পারে।

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা গিয়াছে তাহা হইল, হেকমতে এলাহীর সামনে পুরাপুরিভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার যে কোন হুকুমকে গ্রহণ করিয়া লওয়া ও উহার প্রতি

আত্মসমর্পণ করা চাই। কেননা শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি উঠিয়া যাওয়া বাহ্যত একটি বড় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হওয়া মনে হইলেও যেহেতু উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘটিয়াছে, কাজেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, হয়ত ইহাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি সর্বদাই মেহেরবান ও অনুগ্রহশীল। কোন পাপের কারণে বান্দা যদি মুসীবতে পড়িয়া যায় অতঃপর সে আল্লাহর দিকে সামান্যও রুজু হয় ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে, তবে মহান আল্লাহর দয়া তাহাকে ঘিরিয়া লয় এবং সেই মুসীবতকেও তাহার জন্য বড় কল্যাণের কারণ বানাইয়া দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন কিছুই মুশকিল নয়।

অতএব, শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকার মধ্যেও বেশ কিছু হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন।

এক. শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে অনেক দুর্বল মনের লোক এমন হইত যাহারা অন্যান্য রাত্রের এবাদত একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিত। বর্তমান অবস্থায় আজই শবে কদর হইতে পারে এই সম্ভাবনায় অনুসন্ধানকারীদের জন্য বিভিন্ন রাত্রে এবাদত করার তওফীক নসীব হইয়া যায়।

দুই. অনেক মানুষ এমন আছে যাহারা গোনাহ না করিয়া থাকিতেই পারে না। শবে কদর নির্দিষ্ট হইলে ঐ নির্দিষ্ট রাত্র জানা থাকার পরও যদি গোনাহের দুঃসাহস করিত তবে তাহারা নিশ্চিত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ আনার পর দেখিলেন যে, জনৈক সাহাবী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি তাহাকে জাগাইয়া দাও যেন সে ওযূ করিয়া নেয়। হযরত আলী (রাযিঃ) লোকটিকে জাগাইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নেক কাজে তো আপনি খুবই দ্রুত আগাইয়া যান কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি নিজে তাহাকে জাগাইলেন না কেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি জাগাইতে গেলে (ঘুমের ঘোরে) হয়ত সে অস্বীকার করিয়া বসিত। আর আমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে তোমার কথা অস্বীকার করিলে কুফর হইবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করিলেন না যে, এই মহান মর্যাদাবান রাত্রটির

কথা জানার পর কোন বান্দা উহাতে গোনাহের দুঃসাহস করুক।

তিন. শবে কদর নির্দিষ্ট থাকিলে যদি ঘটনাক্রমে কাহারও এই রাত্রটি ছুটিয়া যাইত, তবে মনোকষ্টের দরুন তাহার জন্য আর কোন রাত্র জাগরণই নসীব হইত না। এখন তো অন্তত রমযানের দুই একটি রাত্র জাগা সকলের ভাগ্যে জুটিয়াই যায়।

চার. যতগুলি রাত্র শবে কদরের তালাশে জাগিয়া থাকিবে প্রত্যেকটির জন্যই পৃথক পৃথক সওয়াব লাভ করিবে।

পাঁচ. পূর্বে এক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রমযানের এবাদতের উপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিয়া থাকেন। শবে কদর অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় গর্ব করার সুযোগ বেশী হয়। কেননা, তারিখ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে বান্দা রাত্রের পর রাত্র জাগিয়া এবাদতে মশগুল হইয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইত যে, এই রাত্রই শবে কদর, তবে কি তাহারা এত রাত্র জাগ্রত থাকিয়া এবাদত করিতে চেষ্টা করিত?

এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য কল্যাণও থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এই সব কারণে আল্লাহ তায়ালার বিধান এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে যে, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তিনি গোপন করিয়া রাখেন। যেমন ইস্‌মে আজমকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এমনিভাবে জুমার দিনে দোয়া কবূল হওয়ার খাছ ওয়াক্তকেও গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অনুরূপভাবে আরও বহু বিষয়ই তিনি গোপন রাখিয়া দিয়াছেন। অবশ্য এখানে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ঝগড়ার কারণে শুধুমাত্র সেই রমযানেই শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখটি ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর উল্লেখিত অন্যান্য হেকমত ও কল্যাণের কারণে চিরদিনের জন্যই অনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি এই পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে তাহা এই যে, শবে কদর নবম, সপ্তম ও পঞ্চম এই তিনটি রাত্রে তালাশ করিতে বলা হইয়াছে। অন্যান্য রেওয়ায়াত মিলাইলে এইটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, এই তিনটি রাত্রই শেষ দশকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারপরও আরও কয়েকটি সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তাহা এই যে, শেষ দশ দিনকে যদি শুরু হইতে গণনা করা হয় তবে হাদীসের অর্থ ২৯, ২৭ ও ২৫তম রাত্রি হয়। আর যদি শেষ দিক হইতে গণনা করা হয় যেমন হাদীসের কোন কোন শব্দের দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় এবং চাঁদ ঊনত্রিশা হয় তবে ২১, ২৩ ও ২৫তম রাত্রি হইবে। পক্ষান্তরে চাঁদ ত্রিশা হইলে তিন রাত্রি ২২, ২৪ ও

২৬তম রাত্রি হইবে।

ইহা ছাড়াও শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের রেওয়ায়াত রহিয়াছে। আর এই কারণেই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের প্রায় ৫০টির মত উক্তি রহিয়াছে। অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে রেওয়ায়াতের মধ্যে এত বেশী পার্থক্যের কারণ এই যে, এই রাত্রটি কোনো বিশেষ তারিখের সহিত নির্দিষ্ট নয়। বরং বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন রাত্রে হইয়া থাকে। এ কারণেই রেওয়ায়াতও বিভিন্ন রকম আসিয়াছে। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বৎসর ঐ বৎসরেরই বিভিন্ন রাত্রে তালাশ করার হুকুম করিয়াছেন। আবার কোন কোন বৎসর নির্দিষ্ট করিয়াও বলিয়াছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শবে কদরের আলোচনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ কোন্ তারিখ? আরজ করা হইল, আজ ২২ তারিখ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রেই তালাশ কর। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম যে, শবে কদর কি শুধু নবীর যমানাতেই হইয়া থাকে, নাকি তাঁহার পরেও হয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। আমি আরজ করিলাম, উহা রমযানের কোন অংশে হয়? তিনি বলিলেন, প্রথম ও শেষ দশকে উহা তালাশ কর। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য প্রসঙ্গে কথা বলিতে শুরু করিলেন। পরে আমি সুযোগ বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতটুকু তো বলিয়া দিন যে শবে কদর দশকের কোন্ অংশে হয়। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি এত বেশী নারাজ হইলেন যে, ইহার পূর্বে বা পরে তিনি আমার প্রতি আর কখনও এত নারাজ হন নাই। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার যদি ইহা মর্জী হইত তবে জানাইয়া দিতেন। শেষের সাত রাত্রিতে উহা তালাশ কর। অতঃপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

জনৈক সাহাবীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩তম রাত্রির কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একরাত্রে আমি ঘুমাইতে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে কেউ বলিল যে, উঠ! আজ শবে কদর। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম হইতে উঠিয়া হযরত নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তখন তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিতেছিলেন। আর এই রাত্রটি ছিল ২৩তম রাত্রি। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ২৪তম রাত্রির কথাও জানা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বৎসর রাত্রি জাগরণ করিবে, সে শবে কদর পাইবে। অর্থাৎ শবে কদর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেহ ইবনে কা'ব (রাযিঃ)কে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর এই কথা নকল করিয়া শুনাইলে তিনি বলিলেন যে, ইহার দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন একরাত্রির উপর ভরসা করিয়া বসিয়া না থাকে। অতঃপর তিনি কসম খাইয়া বলিলেন যে, কদর রমযানের ২৭তম রাত্রিতে হইয়া থাকে। এমনিভাবে অনেক সাহাবী (রাযিঃ) ও তাবেঈর মতে ২৭তম রাত্রিতেই কদর হয়। ইহাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর অভিমত হইল, যে ব্যক্তি সারা বৎসর জাগিয়া থাকিবে সেই উহা পাইতে পারে। 'দুররে মানসূর' কিতাবের এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এরূপই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন। ইমামগণের মধ্যে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর প্রসিদ্ধ মত হইল যে, উহা সারা বৎসরই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর দ্বিতীয় অভিমত হইল উহা পুরা রমযানে ঘুরিতে থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মত হইল, উহা রমযান মাসের কোন এক রাত্রে আসে—যাহা নির্দিষ্ট ; কিন্তু আমাদের জানা নেই। শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণের জোরদার মত হইল, উহা ২১তম রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর অভিমত হইল উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে আসে। একেক বৎসর একেক তারিখে হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ২৭তম রাত্রিতেই উহার বেশী আশা করা যায়। শায়খুল আরেফীন মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ঐসব লোকের অভিমতই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয় যাহারা বলেন যে, উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা বৎসরই আসিয়া থাকে। কেননা, আমি শাবান মাসে উহা দুইবার দেখিয়াছি। একবার ১৫ তারিখে আরেক বার ১৯ তারিখে। আর দুইবার রমযান মাসের মধ্য দশকের ১৩ ও ১৮ তারিখে দেখিয়াছি। এছাড়া রমযান মাসের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রগুলিতেও দেখিয়াছি। তাই আমার একীন হইল যে, উহা বৎসরের সকল রাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া থাকে। তবে

রমযান মাসেই বেশী আসে। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) বলেন, "শবে কদর বৎসরে দুইবার হয়। একটি হইল ঐ রাত্র, যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম নাযিল হয়। আর এই রাত্রেই কুরআন শরীফ লওহে মাহফূজ হইতে নাযিল হইয়াছে। এই রাত্রটি রমযানের সহিত খাছ নয় বরং সারাবৎসরই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। তবে যে বৎসর পবিত্র কুরআন নাযিল হইয়াছে, সেই বৎসর উহা রমযানুল মুবারকেই ছিল। আর উহা অধিকাংশ সময় রমযানুল মুবারকেই হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় শবে কদর হইল ঐ রাত্র, যাহাতে রূহানী জগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, অধিক পরিমাণে ফেরেশতা জমিনে নাযিল হয়। শয়তান দূরে থাকে। দোয়া ও এবাদতসমূহ কবূল হয়। ইহা প্রত্যেক রমযানে হইয়া থাকে এবং অদল বদল হইয়া রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতেই হয়।" আমার আব্বাজান (রহঃ) এই মতটিকেই প্রাধান্য দিতেন।

মোটকথা, শবে কদর একটি হউক বা দুইটি হউক ; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের হিম্মত, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সারা বৎসর উহার তালাশে চেষ্টা করা উচিত। এতখানি সম্ভব না হইলে অন্তত পুরা রমযান মাস অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যদি ইহাও মুশকিল হয় তবে শেষ দশ দিনকে তো গনীমত মনে করাই চাই। আর যদি এতটুকুও না হয় তবে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিকে তো কোনভাবেই হাতছাড়া করিবে না। খোদা না করুন যদি ইহাও না হয় তবে একেবারে কমপক্ষে ২৭তম রাত্রটিকে তো অবশ্য গনীমত মনে করিতেই হইবে। যদি আল্লাহর রহমত শামিল থাকে এবং কোন খোশ-নসীব বান্দার ভাগ্যে উহা জুটিয়া যায় তাহা হইলে তো সমস্ত দুনিয়ার নেয়ামত ও আরাম আয়েশ উহার মুকাবিলায় কিছুই নয়। আর যদি শবে কদর নাও পায় তবুও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সারা বৎসরই মাগরিব ও এশার নামায মসজিদে জামাতের সহিত আদায় করার এহতেমাম করা খুবই জরুরী। যদি ভাগ্যক্রমে শবে কদরের রাত্রে এই দুই ওয়াক্ত নামায জামাতের সহিত আদায় করা নসীব হইয়া যায়, তবে কত অসংখ্য নামায জামাতে আদায় করার সওয়াব পাইয়া যাইবে। আল্লাহর কত বড় মেহেরবানী যে, যদি কোন দ্বীনী কাজের জন্য চেষ্টা করা হয় তবে উহাতে কামিয়াব না হইলেও আমলকারী ব্যক্তি চেষ্টার সওয়াব অবশ্যই পাইয়া যায়। কিন্তু এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কতজন হিম্মতওয়ালা মানুষ এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহারা দ্বীনের জন্য লাগিয়াই থাকেন ; দ্বীনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

ও মেহনত করেন। অথচ ইহার বিপরীতে দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে চেষ্টা-তদবীরের পর উদ্দেশ্য হাসিল না হইলে সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রম বেকার হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কত মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ হাসিলের জন্য বেফায়দা লক্ষ্যের পিছনে জান ও মাল দুইটিই বরবাদ করিয়া চলিয়াছে।

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بکجا

অর্থাৎ, দেখ, পথের ব্যবধান কতদূর—কোথা হইতে কোথা পর্যন্ত !

(٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهٗ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ فِىْ رَمَضَانَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاِنَّهَا فِىْ لَيْلَةِ وِتْرٍ فِىْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ اَوْ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ مَنْ قَامَهَا اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمِنْ اَمَارَاتِهَا اَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا حَارَّةٌ وَّلَا بَارِدَةٌ كَاَنَّ فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا وَّلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ اَنْ يُّرْمٰى بِهٖ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَمِنْ اَمَارَاتِهَا اَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيْحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَةً كَاَنَّهَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى الشَّيْطَانِ اَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ. (درمنثور عن احمد و البیہقی و محمد بن نصر وغیرهم)

حضرت عُبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شبِ قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، یا رمضان کی آخر رات میں، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ مُعتدِل گویا کہ اس میں (انوار کی کثرت کی وجہ سے) چاند کھلا ہوا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے نیز اسکی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شُعاع کے طُلوع ہوتا ہے ایسا بالکل ہموار ٹکیہ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند اللہ جلّ شانُہٗ نے اس دن کے آفتاب

کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا بخلاف اور دنوں کے کر طلوعِ آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔

(৬) উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরশাদ ফরমান যে, উহা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখে বা রমযানের শেষ রাত্রে হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ় একীনের সহিত সওয়াবের আশায় এই রাত্রে এবাদতে মশগুল হয়, তাহার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়। এই রাত্রের অন্যান্য আলামতের মধ্যে একটি হইল, এই রাত্রটি নির্মল ঝলমলে হইবে, নিঝুম, নিথর—না অধিক গরম, না অধিক ঠাণ্ডা ; বরং মধ্যম ধরনের হইবে। (নূরের আধিক্যের কারণে) চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রের ন্যায় মনে হইবে। এই রাত্রে সকাল পর্যন্ত শয়তানের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। উহার আরো একটি আলামত এই যে, পরদিন সকালে সূর্য কিরণবিহীন একেবারে গোলাকার পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদিত হয়। আল্লাহ পাক সেইদিনের সূর্যোদয়ের সময় উহার সহিত শয়তানের আত্মপ্রকাশকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (পক্ষান্তরে অন্যান্য দিন সূর্যোদয়ের সময় সেখানে শয়তান আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।) (দুররে মানসূর ঃ আহমদ, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের প্রথম বিষয়বস্তু তো পূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহেও আসিয়াছে। হাদীসের শেষ অংশে শবে কদরের কয়েকটি আলামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যেগুলির অর্থ ও মতলব অত্যন্ত পরিষ্কার। কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আরও কিছু আলামত বিভিন্ন রেওয়ায়াত এবং ঐ সকল লোকদের বর্ণনায় আসিয়াছে, যাহাদের এই পুণ্যময় রজনীর অফুরন্ত দৌলত নসীব হইয়াছে। বিশেষতঃ এই রাত্রের পর 'ভোরবেলায় সূর্য কিরণবিহীন উদিত হয়' এই কথাটি হাদীসের বহু রেওয়ায়াতে আসিয়াছে এবং এই আলামতটি সর্বদাই পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য আলামত পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়। আবদাহ ইবনে আবী লুবাবা (রাযিঃ) বলেন, আমি রমযানের ২৭তম রাত্রিতে সমুদ্রের পানি মুখে দিয়া দেখিয়াছি। উহা সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। আইয়ুব ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হয়, আমি সমুদ্রের পানিতে গোসল করি। এই সময় পানি সম্পূর্ণ মিষ্টি ছিল। ইহা রমযানের ২৩তম রাত্রির ঘটনা।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, শবে কদরে প্রতিটি বস্তু সিজদা করে।

এমনকি বৃক্ষসমূহ যমীনের উপর সিজদায় পড়িয়া যায়। আবার নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াইয়া যায়। তবে এই সকল বিষয় অন্তর্চক্ষুর সহিত সম্পর্ক রাখে, যে কোন মানুষ অনুভব করিতে পারে না।

(٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (رواه احمد وابن ماجة والترمذى وصححه كذا فى المشكوة)

حضرت عائشہؓ نے حضورؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں حضورؐ نے اَللّٰھُمَّ سے اخیر تک دعا بتلائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ تو بیشک مُعاف کرنیوالا ہے اور پسند کرتا ہے مُعاف کرنے کو، پس مُعاف فرمادے مجھ سے بھی۔

(৭) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি যদি শবে কদর পাইয়া যাই, তবে কি দোয়া করিব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন—এই দোয়া করিও—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

(মিশকাত ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

ফায়দা ঃ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ দোয়া! আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আখেরাতের জবাবদেহিতা হইতে মুক্তি দিয়া দিলে উহার চাইতে বড় নেয়ামত আর কী হইতে পারে!

من نگویم کہ طاعتم بپذیر — قلمِ عفو برگناہم کش

অর্থাৎ, আমি এই কথা বলি না যে, আমার এবাদত কবূল কর ; আমার সবিনয় আরজ এই যে, হে আল্লাহ! আমার সমুদয় গোনাহ–খাতা মেহেরবানী করিয়া মাফ করিয়া দাও।

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, এই রাত্রে দোয়ায় মশগুল থাকা অন্য যে কোন এবাদতের চাইতে উত্তম। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, শুধু দোয়া নয় বরং বিভিন্ন প্রকারের এবাদত করাই উত্তম। যেমন নামায, তেলাওয়াত, দোয়া, মুরাকাবা ইত্যাদি। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সবগুলি এবাদতই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কারণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে নামায, যিকির ইত্যাদি কয়েকটি এবাদতেরই বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের বর্ণনা

এতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলে। হানাফীগণের নিকট এতেকাফ তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার—ওয়াজিব এতেকাফ, যাহা কোন কাজের উপর মান্নত করার কারণে ওয়াজিব হয়। যেমন কেহ বলিল যে, যদি আমার অমুক কাজটি হইয়া যায়, তবে আমি এতদিন এতেকাফ করিব। অথবা কোন কাজের শর্ত ব্যতীত এমনিতেই এইরূপ মান্নত করিল যে, আমি আমার উপর এতদিনের এতেকাফ জরুরী করিয়া নিলাম। অর্থাৎ আমি অবশ্যই এতদিন এতেকাফ করিব—এইভাবে বলিলেও এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া যায়। অতএব, যতদিনের নিয়ত করিবে ততদিনের এতেকাফ করা জরুরী হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার—সুন্নত এতেকাফ, যাহা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনগুলিতে এতেকাফ করিতেন।

তৃতীয় প্রকার—নফল এতেকাফ, ইহার জন্য কোন সময় বা দিনকাল নির্দিষ্ট নাই। যতক্ষণ বা যতদিন ইচ্ছা করা যাইবে এমনকি কেহ সারাজীবন এতেকাফের নিয়ত করিলেও জায়েয হইবে। তবে কম সময়ের জন্য এতেকাফের নিয়তের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর মতে একদিনের কম এতেকাফ জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে সামান্য সময়ের জন্যও এতেকাফ করা জায়েয আছে। আর এই মতের উপরই ফতওয়া। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিত হইল, যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিবে। তাহা হইলে যতক্ষণ সে নামায ইত্যাদি অন্যান্য এবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ সে এতেকাফেরও সওয়াব পাইয়া যাইবে।

আমি আমার আব্বাজান (রহঃ)কে সর্বদা এই এহ্‌তেমাম করিতে দেখিয়াছি যে, তিনি যখন মসজিদে তাশরীফ নিয়া যাইতেন তখন ডান পা মসজিদে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এতেকাফের নিয়ত করিয়া নিতেন।

খাদেমগণকে তালীম দেওয়ার জন্য কখনও কখনও আওয়াজ করিয়াও নিয়ত করিতেন।

এতেকাফের সওয়াব অনেক বেশী। এতেকাফের ফযীলত ইহার চাইতে বেশী আর কী হইবে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ইহার এহ্‌তেমাম করিতেন। এতেকাফকারীর দৃষ্টান্ত হইল ঐ ব্যক্তির মত যে কাহারও দরজায় গিয়া পড়িয়া রহিল আর বলিতে থাকিল যে, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান হইতে যাইব না।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

অর্থ ঃ তোমার পদতলে আমার জীবন শেষ হউক—ইহাই আমার হৃদয়ের আকুতি, ইহাই আমার পরম প্রাপ্তি।

প্রকৃতপক্ষেই যদি কাহারও অবস্থা এ–ই হয় তবে চরম নিষ্ঠুর হৃদয়ও না গলিয়া পারে না। আর অসীম দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তো দেওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। বরং কোন বাহানা ছাড়াই দান করিয়া থাকেন।

تُو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے در تری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے

অর্থ ঃ হে দয়াময়! তুমি তো এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার রহমতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

অর্থ ঃ আল্লাহর দানের অবস্থা হযরত মূসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আগুন আনিতে যাইয়া পয়গাম্বরী পাইয়া গেলেন।

অতএব, কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার যাবতীয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া মহান আল্লাহর দরবারে আছড়াইয়া পড়িবে তখন তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যাপারে কি কোন দ্বিধা থাকিতে পারে! আল্লাহ তায়ালা যখন কাহাকেও দিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার ভরপুর খাযানার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কাহার আছে? ইহা হইতে বেশী বলিতে আমি অক্ষম যে, নাবালেগ কি কখনও বালেগ হওয়ার স্বাদ বর্ণনা করিতে পারে? তবে হাঁ, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়া নিবে যেমন কবি বলেন—

جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے

অর্থ ঃ যে ফুলকে হৃদয় দিয়াছি, যে ফুলের জন্য আমি কুরবান, সেই ফুল হয়ত হাতে আসিবে ; নতুবা জীবন পাখী পিঞ্জর ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইবে।

ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেন, এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং উহার প্রাণ হইল, অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার পাক যাতের সহিত এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করিয়া নেওয়া যে, পার্থিব সকল মোহ ছিন্ন হইয়া আল্লাহ পাকের সহিত মিলিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সমস্ত ধ্যান–খেয়ালের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ পাকের ধ্যান–খেয়ালে নিমগ্ন হইয়া যায়। গায়রুল্লার সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া এমনভাবে আল্লাহর অনন্ত সান্নিধ্যে ডুবিয়া যাইবে যে, সকল চিন্তা–চেতনা ও কল্পনায় একমাত্র তাঁহারই পাক যিকির এবং তাঁহারই মহব্বত প্রবিষ্ট হইয়া যায়। মাখলুকের ভালবাসা বিদূরিত হইয়া শুধু আল্লাহর সুনির্মল ভালবাসাই হৃদয়–মনে সৃষ্টি হইয়া যাইবে। এই ভালবাসাই নির্জন কবরের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কাজে আসিবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ তায়ালার পাক যাত ব্যতীত একান্ত বন্ধু ও সান্ত্বনা দানকারী আর কেহ থাকিবে না। পূর্ব হইতেই যদি তাহার সহিত মনের সম্পর্ক কায়েম হইয়া থাকে তবে সেখানে কি আনন্দ–উপভোগেই না সময় কাটিবে।

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن   بیٹھا رہوں تصوّرِ جاناں کئے ہوئے

অর্থ ঃ আমার মন সেই সুবর্ণ সুযোগ খুঁজিতেছে, যাহাতে রাত্রদিন প্রেমাস্পদের ধ্যানে বসিয়া থাকি।

‘মারাকিল ফালাহ’এর গ্রন্থকার বলেন, এতেকাফ যদি এখলাসের সহিত হয় তবে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। উহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনাতীত। কারণ, ইহাতে সংসার জগতের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন করা হয়। স্বীয় নফসকে মাওলা পাকের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়া মনিবের দুয়ারে পড়িয়া থাকা হয়।

پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں   سر زیرِ بارِ منّتِ درباں کئے ہوئے

অর্থ ঃ আবার মন চায়, দারোয়ানের দয়ার বোঝা মাথায় লইয়া কাহারো দুয়ারে পড়িয়া থাকি।

তদুপরি উহাতে সবসময় এবাদতে মগ্ন থাকা হয়। কেননা, এতেকাফকারীকে ঘুমন্ত জাগ্রত সর্বাবস্থায় এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয় ; এইভাবে সর্বদা আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যমান থাকে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—‘যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।’

ইহা ছাড়াও এতেকাফে আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা হয় এবং দয়ালু মেজবান সর্বদা নিজ মেহমানের সম্মান করিয়াই থাকেন। সর্বোপরি, এতেকাফকারী আল্লাহর দুর্গে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে যেখানে শত্রু প্রবেশ করিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের আরও অসংখ্য ফাযায়েল ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য এতেকাফের সর্বোত্তম স্থান হইল মক্কার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, তারপর মদীনার মসজিদে নববী, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ। অতঃপর জামে মসজিদ, অতঃপর স্থানীয় মহল্লার মসজিদ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)এর মতে এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)এর মতে মসজিদ হওয়াই যথেষ্ট। জামাআত না হইলেও এতেকাফের ক্ষতি হইবে না। মহিলাগণ নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে এতেকাফ করিবেন। যদি ঘরে নামাযের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান না থাকে তবে এতেকাফের জন্য কোন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবেন। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এতেকাফ অধিকতর সহজ। কেননা, তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মেয়ে বা অন্য কাহারও দ্বারা সংসারের কাজকর্মও করাইতে পারেন, আবার অনায়াসে এতেকাফের সওয়াবও হাসিল করিতে পারেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহিলাগণ এই সুন্নত হইতে প্রায় বঞ্চিতই থাকিয়া যান।

(১) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِعْتَکَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَکَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِیْ قُبَّۃٍ تُرْکِیَّۃٍ ثُمَّ اَطْلَعَ رَاْسَہٗ فَقَالَ اِنِّیْ اَعْتَکِفُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ اَلْتَمِسُ ھٰذِہِ اللَّیْلَۃَ ثُمَّ اَعْتَکِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِیْتُ فَقِیْلَ لِیْ اِنَّھَا فِی الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ کَانَ اِعْتَکَفَ مَعِیْ فَلْیَعْتَکِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَقَدْ اُرِیْتُ ھٰذِہِ اللَّیْلَۃَ

ابو سعید خدری رض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شبِ قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے (یعنی فرشتہ) نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں

ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوا فِي كُلِّ وِتْرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (مشكوة عن المتفق عليه باختلاف اللفظ)

وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی (اس کی علامت یہ ہے) کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی، اور مسجد چھپّر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر اکیس(۲۱) کی صبح کو دیکھا۔

হাদীস-১ ঃ হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানুল মুবারকের প্রথম দশকে এতেকাফ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এতেকাফ করিলেন। অতঃপর তুর্কি তাঁবু (যাহাতে তিনি এতেকাফ করিতেছিলেন) হইতে মাথা মুবারক বাহির করিয়া এরশাদ করিলেন, আমি প্রথম দশকে শবে কদরের তালাশেই এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর দ্বিতীয় দশকেও এই একই উদ্দেশ্যে এতেকাফ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমাকে একজন (ফেরেশতা) বলিল যে, উহা শেষ দশকে। সুতরাং যাহারা আমার সহিত এতেকাফ করিতেছে, তাহারা যেন শেষ দশকেও এতেকাফ করে। এই রাত্রটি আমাকে দেখানো হইয়াছিল। পরে আবার ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে উহার আলামত এই যে, আমি আমাকে এই রাত্র শেষে সকালবেলা কাদা মাটিতে সেজদা করিতে দেখিয়াছি। কাজেই তোমরা উহাকে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে তালাশ কর। বর্ণনাকারী বলেন, সেই রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। মসজিদ ছাপড়া হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি ভিতরে টপকাইয়া পড়িয়াছিল। আমি একুশ তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল মুবারকে স্বচক্ষে কাদামাটির চিহ্ন দেখিয়াছি।

(মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় রমযান মাসে এতেকাফ করিতেন। এই বৎসর পুরা রমযান মাস এতেকাফ

করিয়াছেন এবং ওফাতের বছর বিশ দিন এতেকাফ করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ রমযানের শেষ দশকেই এতেকাফ করিতেন। এইজন্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইল, শেষ দশ দিন এতেকাফ করাই সুন্নতে মুআক্কাদা। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, এই এতেকাফের বড় উদ্দেশ্য হইল শবে কদর তালাশ করা। বস্তুতঃ শবে কদর পাওয়ার জন্য এতেকাফ খুবই উপযোগী আমল। কারণ, এতেকাফ অবস্থায় বান্দা যদি ঘুমাইয়াও থাকে তবুও তাহাকে এবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হয়।

ইহা ছাড়াও এতেকাফ অবস্থায় যেহেতু চলাফেরা ও কাজকর্ম বলিতে কিছু থাকে না সুতরাং এই সময় দয়াময় মাওলার স্মরণ ও এবাদত–বন্দেগী ব্যতীত আর কোন চিন্তা বা কাজও থাকিবে না, তাই শবে কদর তালাশকারীদের জন্য এতেকাফের চাইতে উত্তম কোন সুযোগ ও পন্থা নাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা রমযান মাসই অধিক পরিমাণে এবাদত–বন্দেগী করিতেন। কিন্তু শেষ দশকে এত বেশী করিতেন যে, ইহার কোন সীমা থাকিত না। রাত্রে নিজেও জাগিতেন এবং পরিবারের লোকদিগকেও বিশেষভাবে জাগাইবার এহ্‌তেমাম করিতেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের বহু রেওয়ায়াত হইতে ইহা জানা যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিতেন এবং রাত্রি জাগরণ করিতেন। পরিবারের লোকদিগকেও জাগাইয়া দিতেন। 'লুঙ্গি মজবুত করিয়া বাঁধা'র অর্থ এবাদতে অধিক পরিমাণে চেষ্টা ও এহতেমাম করাও হইতে পারে অথবা স্ত্রীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকার অর্থও হইতে পারে।

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرٰى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا (مشكوة عن ابن ماجة)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لئے۔

হাদীস-২ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এতেকাফকারী যাবতীয় গোনাহ হইতে মুক্ত থাকে এবং তাহার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লিখা হয় যে পরিমাণ আমলকারীর জন্য লিখা হইয়া থাকে। (মিশকাত ঃ ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে এতেকাফের দুইটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রথমতঃ এতেকাফের কারণে গোনাহ হইতে হেফাজত হয়। কেননা কোন কোন সময় গাফলত ও ভুল-ত্রুটির কারণে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায়, যাহাতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আর এই মুবারক সময়ে গোনাহ হইয়া যাওয়া কত বড় অন্যায় ! এতেকাফের ওসীলায় এইসব গোনাহ হইতে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ এতেকাফে বসিবার কারণে রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক হওয়া ইত্যাদি বহু নেক কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এতেকাফের ওসীলায় এইসব এবাদত না করিয়াও সে এইগুলির সওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহু আকবার কত বড় দয়া ! আর কত বড় রহমত ! মানুষ এবাদত করে একটি আর সওয়াব পাইতে থাকে দশটির। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত শুধু বাহানাই তালাশ করে ; সামান্য আগ্রহ ও চাহিদামাত্রই মুষলধারে বর্ষিত হইতে থাকে।

بہانہ مے دہد بہانمے دہد

অর্থ ঃ সামান্য বাহানায় অনেক কিছু দিয়া দেন আবার অনেক যোগ্যতার উপরও কিছুই দেন না।

কিন্তু আমাদের নিকট উহার কোন কদরই নাই ; উহার প্রয়োজনই নাই, কাজেই দয়া কে করিবে? আর কেনই বা করিরে? আমাদের অন্তরে তো দ্বীনের কোন গুরুত্বই নাই।

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

অর্থাৎ, হে শহীদি ! আল্লাহর অপার অনুগ্রহ তো সকলের প্রতিই সমান বর্ষিত হয়। যদি তুমি যোগ্য হইতে তবে তোমার প্রতি তো তাহার কোন জিদ ছিল না।

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ اَنَّهٗ كَانَ مُعْتَكِفًا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍؓ يَا فُلَانُ اَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِيْنًا قَالَ نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِفُلَانٍ عَلَىَّ حَقٌّ وَلَا وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هٰذَا

الْقَبْرِ مَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَفَلَا اُكَلِّمُهٗ فِيْكَ قَالَ اِنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ اَنَسِيْتَ مَا كُنْتَ فِيْهِ قَالَ لَا وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهْدُ بِهٖ قَرِيْبٌ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ مَّشٰى فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ وَبَلَغَ فِيْهَا كَانَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اِعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِيْنَ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلٰثَ خَنَادِقَ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.

(رواه الطبرانى فى الاوسط والبيهقى واللفظ له والحاكم مختصرا وقال صحيح الاسناد وكذا فى الترغيب وقال السيوطى فى الدر صححه الحاكم وضعفه البيهقى)

حضرت ابن عباس رضؓ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں معتکف تھے آپکے پاس ایک شخص آیا اور سلام کرکے (چپ چاپ) بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اُس سے فرمایا کہ میں تمھیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے اُس نے کہا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے میں بیشک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں اُس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباسؓ یہ سُنکر جوتہ پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سُنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گذرا (یہ لفظ کہتے ہوئے) ابن عباسؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضورؐ فرمارہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کیلئے دس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کیواسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانُہٗ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ (اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو دس برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی)

হাদীস-৩ ঃ একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে এতেকাফ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল এবং সালাম করিয়া চুপচাপ বসিয়া পড়িল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান দেখিতেছি ! লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই ! নিশ্চয়

আমি খুবই চিন্তিত ও পেরেশান। কেননা অমুক ব্যক্তির নিকট আমি ঋণী আছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই কবরওয়ালার ইয্যতের কসম! ঐ ঋণ আদায় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমি কি তোমার জন্য তাহার নিকট সুপারিশ করিব? লোকটি বলিল, আপনি যাহা ভাল মনে করেন। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ জুতা পরিয়া মসজিদের বাহিরে আসিলেন। লোকটি বলিল, আপনি কি এতেকাফের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, ভুলি নাই। তবে খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি এই কবরওয়ালার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট শুনিয়াছি (এই কথা বলিবার সময়) ইবনে আব্বাসের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল— তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে চলাফেরা করিবে এবং চেষ্টা করিবে, উহা তাহার জন্য দশ বছর এতেকাফ করার চাইতেও উত্তম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। যাহার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইতেও অধিক। (একদিনের এতেকাফের ফযীলতই যখন এইরূপ তখন দশবছরের এতেকাফের ফযীলত কি পরিমাণ হইবে!)

(তাবারানী, বাইহাকী, হাকিম, তারগীব)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের দ্বারা দুইটি বিষয় বুঝা যাইতেছে। এক. একদিনের এতেকাফের সওয়াব হইল, আল্লাহ তায়ালা এতেকাফকারী ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন। আর প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব আসমান–জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী। আর একদিনের অধিক যত বেশীদিনের এতেকাফ হইবে উহার সওয়াবও তত বেশী বাড়িয়া যাইবে। আল্লামা শারানী (রহঃ) 'কাশফুল গুম্মাহ' কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন এতেকাফ করিবে, সে দুই হজ্জ ও দুই উমরার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়া হয় এমন মসজিদে মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত এতেকাফ করিবে এবং এই সময় কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বুঝা যায় তাহা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর

তাহা হইল, কোন মুসলমানের জরুরত পুরা করা। যাহাকে দশ বৎসরের এতেকাফের চাইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। এই জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নিজের এতেকাফের কোন পরওয়াই করেন নাই। কারণ, পরবর্তী সময়ে কাজা আদায় করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হইতে পারে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি ভগ্ন হৃদয়ের যে কদর হয় তাহা অন্য কোন জিনিসেরই হয় না। এইজন্যই হাদীস শরীফে মজলুমের বদ–দোয়ার ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত ইহাও বলিয়া দিতেন যে, সাবধান! মজলুমের বদ–দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

অর্থ ঃ মজলুমের 'আহ্'কে খুবই ভয় কর। কেননা মজলুম যখন দোয়া করে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে কবুলিয়ত আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে।

মাসআলা ঃ এখানে একটি মাসআলার প্রতি লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। তাহা এই যে, এতেকাফ অবস্থায় কোন মুসলমানের উপকারের জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইলেও এতেকাফ ভাঙ্গিয়া যায়। এতেকাফ ওয়াজিব হইয়া থাকিলে উহা কাজা করাও ওয়াজিব হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন অর্থাৎ প্রস্রাব–পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে মসজিদের বাহিরে যাইতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) অপরের জন্য নিজের এতেকাফ ভঙ্গ করিয়া যে বিরাট কুরবানী করিলেন, এইরূপ কুরবানী কেবল ঐ সমস্ত মহাপুরুষের জন্য শোভা পায় যাহারা অপরের প্রাণ রক্ষার্থে নিজে তৃষ্ণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করেন ; মুখের নিকট পেয়ালা ভর্তি পানি পাইয়াও শুধু এইজন্য পান করেন না যে, তাহার পার্শ্বেই অপর এক আহত ভাই তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে ; এই পানি আগে তাহারই প্রয়োজন বেশী।

অবশ্য এখানে এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর এই এতেকাফ নফল এতেকাফ ছিল। তাহা হইলে বিষয়টি সহজ হইয়া যায়। কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

এখানে পরিশিষ্টরূপে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া এই কিতাব সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই হাদীসে বিভিন্ন প্রকার ফাযায়েল এরশাদ হইয়াছে।

(৪) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ سَمِعَ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُبَخَّرُ وَتُزَيَّنُ
مِنَ الْحَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ لِدُخُوْلِ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَاِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ
مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ
مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا
الْمُثِيْرَةُ فَتُصَفِّقُ وَرَقُ اَشْجَارِ
الْجِنَانِ وَحَلَقُ الْمَصَارِيْعِ فَيُسْمَعُ
لِذٰلِكَ طَنِيْنٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ
اَحْسَنَ مِنْهُ فَتَبْرُزُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ
حَتّٰى يَقِفْنَ بَيْنَ شُرَفِ الْجَنَّةِ
فَيُنَادِيْنَ هَلْ مِنْ خَاطِبٍ اِلَى
اللّٰهِ فَيُزَوِّجَهٗ ثُمَّ يَقُلْنَ الْحُوْرُ
الْعِيْنُ يَا رِضْوَانَ الْجَنَّةِ مَا هٰذِهِ
اللَّيْلَةُ فَيُجِيْبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ
يَقُوْلُ هٰذِهٖ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ
لِلصَّائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا رِضْوَانُ
افْتَحْ اَبْوَابَ الْجِنَانِ وَيَا مَالِكُ
اَغْلِقْ اَبْوَابَ الْجَحِيْمِ عَنِ
الصَّائِمِيْنَ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ

ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے
حضورؐ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنّت
کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی
دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے
آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ
کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی
پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے
ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مُثیرہ ہے
(جس کے جھونکوں کی وجہ سے) جنّت کے
درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے
بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آویز سریلی
آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے
اچھی آواز کبھی نہیں سنی پس خوشنما آنکھوں
والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنّت
کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر
آواز دیتی ہیں، کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں ہم سے منگنی کرنیوالا تاکہ حق تعالیٰ شانہٗ
اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں
جنّت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں
کہ یہ کیسی رات ہے وہ لبّیک کہکر جواب
دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات
ہے۔ جنّت کے دروازے محمّد صلّی اللہ علیہ و
سلّم کی امّت کیلئے (آج) کھول دیئے گئے۔
حضورؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ رضوان سے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا
جِبْرَئِيْلُ اهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ
فَاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ
وَغُلَّهُمْ بِالْاَغْلَالِ ثُمَّ
اقْذِفْهُمْ فِى الْبِحَارِ حَتّٰى
لَا يُفْسِدُوْا عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ
حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِيَامَهُمْ قَالَ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ
وَجَلَّ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُّنَادِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ سُؤْلَهٗ
هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاَتُوْبَ عَلَيْهِ
هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ مَنْ
يُّقْرِضُ الْمَلِىَّ غَيْرَ الْعَدُوْمِ وَ
الْوَفِىَّ غَيْرَ الظَّلُوْمِ قَالَ وَلِلّٰهِ
عَزَّ وَجَلَّ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ اَلْفُ اَلْفِ
عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ
اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَاِذَا كَانَ اٰخِرُ
يَوْمٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَعْتَقَ
اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا
اَعْتَقَ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ
وَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَاْمُرُ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَئِيْلَ فَيَهْبِطُ
فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ
مَعَهُمْ لِوَاءٌ اَخْضَرُ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ

فرماتے ہیں کہ جنّت کے دروازے کھول دے
اور مالک (جہنّم کے داروغہ) سے فرماتے ہیں،
کہ احمد صلّی اللہ علیہ وسلّم کی امّت کے روزہ
داروں پر جہنّم کے دروازے بند کر دے اور
جبرئیلؑ کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور
سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں
طوق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے
محبوب محمّد صلّی اللہ علیہ وسلّم کی امّت کے روزوں
کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم
نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہٗ
رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو
حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے
کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اُسکی توبہ
قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا
کہ میں اُس کی مغفرت کروں، کون ہے
جو غنی کو قرض دے ایسا غنی جو نادار نہیں
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی
نہیں کرتا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ
شانہٗ رمضان شریف میں روزانہ افطار
کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنّم
سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنّم کے
مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا
آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے
آج تک جسقدر لوگ جہنّم سے آزاد کئے
گئے تھے اُن کے برابر اُس ایک دن میں

عَلٰی ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهٗ مِائَةُ
جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا
اِلَّا فِیْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَنْشُرُهُمَا
فِیْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ
اِلَى الْمَغْرِبِ فَيَحُثُّ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ الْمَلٰئِكَةَ فِیْ هٰذِهِ
اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُوْنَ عَلٰی كُلِّ
قَائِمٍ وَّقَاعِدٍ وَّمُصَلٍّ وَّذَاكِرٍ
وَيُصَافِحُوْنَهُمْ وَيُؤَمِّنُوْنَ عَلٰی
دُعَائِهِمْ حَتّٰی يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَاِذَا
طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِیْ جِبْرَئِيْلُ مَعَاشِرَ
الْمَلٰئِكَةِ الرَّحِيْلَ الرَّحِيْلَ فَيَقُوْلُوْنَ
يَا جِبْرَئِيْلُ فَمَا صَنَعَ اللّٰهُ فِیْ
حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اُمَّةِ اَحْمَدَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ نَظَرَ
اللّٰهُ اِلَيْهِمْ فِیْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا
عَنْهُمْ اِلَّا اَرْبَعَةً فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ مُدْمِنُ
خَمْرٍ وَّعَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ وَقَاطِعُ
رَحِمٍ وَّمُشَاحِنٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
مَا الْمُشَاحِنُ قَالَ هُوَ الْمُصَارِمُ
فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ
تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ فَاِذَا
كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللّٰهُ
عَزَّوَجَلَّ الْمَلٰئِكَةَ فِیْ كُلِّ
بِلَادٍ فَيَهْبِطُوْنَ اِلَى الْاَرْضِ

آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب قدر
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ حضرت جبرئیلؑ
کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک
بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اُترتے ہیں
اُن کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے
جس کو کعبہ کے اُوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت
جبرئیل علیہ السلام کے سَو بازو ہیں جن میں
سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے
ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک
پھیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبرئیلؑ
فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان
آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ
رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں
اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین
کہیں، صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔
جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرئیلؑ آواز
دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب
کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ
السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے
مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا
معاملہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ
سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہؓ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں۔ ارشاد
ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو

فَيَقُوْمُوْنَ عَلٰی اَفْوَاهِ السِّكَكِ
فَيُنَادُوْنَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مَنْ
خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا الْجِنَّ وَ
الْاِنْسَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اُخْرُجُوْا اِلٰی رَبٍّ كَرِيْمٍ يُعْطِی
الْجَزِيْلَ وَيَعْفُوْ عَنِ الْعَظِيْمِ فَاِذَا
بَرَزُوْا اِلٰی مُصَلَّاهُمْ فَيَقُوْلُ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ مَا جَزَاءُ
الْاَجِيْرِ اِذَا عَمِلَ عَمَلَهٗ قَالَ
فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ اِلٰهَنَا وَسَيِّدَنَا
جَزَاؤُهٗ اَنْ تُوَفِّيَهٗ اَجْرَهٗ قَالَ
فَيَقُوْلُ فَاِنِّیْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلٰئِكَتِیْ
اَنِّیْ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ
صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ
قِيَامِهِمْ رِضَائِیْ وَمَغْفِرَتِیْ وَ
يَقُوْلُ يَا عِبَادِیْ سَلُوْنِیْ فَوَعِزَّتِیْ
وَجَلَالِیْ لَا تَسْئَلُوْنِیَ الْيَوْمَ شَيْئًا
فِیْ جَمْعِكُمْ لِاٰخِرَتِكُمْ اِلَّا
اَعْطَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ اِلَّا
نَظَرْتُ لَكُمْ فَوَعِزَّتِیْ لَاَسْتُرَنَّ
عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُوْنِیْ
وَعِزَّتِیْ وَجَلَالِیْ لَا اُخْزِيْكُمْ
وَلَا اَفْضَحُكُمْ بَيْنَ اَصْحَابِ
الْحُدُوْدِ وَانْصَرِفُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ
قَدْ اَرْضَيْتُمُوْنِیْ وَرَضِيْتُ عَنْكُمْ
فَتَفْرَحُ الْمَلٰئِكَةُ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا

دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنیوالا
ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور
ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ
رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنیوالا
ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے
تو اُس کا نام (آسمانوں پر) لَیْلَۃُ الْجَائِزَہ (انعام
کی رات) سے لیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح
ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں کو تمام
شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اُتر کر تمام
گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے
ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان
کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت اس کریم ربّ کی
(درگاہ) کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے
والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف
فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف
نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہٗ فرشتوں سے دریافت
فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اُس مزدور کا جو اپنا کام
پورا کر چکا ہو، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے
معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے
کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے
تو حق تعالیٰ شانہٗ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
فرشتو میں تمھیں گواہ بناتا ہوں میں نے اُن
کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں
اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے
خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو

يُعطِى اللهُ عَزَّوَجَلَّ هٰذِهِ الاُمَّةَ اِذَا
اَفْطَرُوْا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔
(كذا فى الترغيب وقال رواه ابو
الشيخ بن حبان فى كتاب الثواب
والبيهقى و اللفظ له وليس فى اسناده
من اجمع على ضعفه قلت قال
السيوطى فى التدريب قد التزم
البيهقى ان لا يخرج فى تصانيفه حديثا
يعلمه موضوعا الخ وذكر القارى
فى المرقاة بعض طرق الحديث ثم قال
فاختلاف طرق الحديث يدل
على ان له اصلا اھ)

مجھ سے مانگو۔ میری عزّت کی قسم میرے جلال
کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے
اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے
عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال
کروگے اس میں تمھاری مصلحت پر نظر
کرونگا۔ میری عزّت کی قسم کہ جب تک تم
میرا خیال رکھوگے میں تمھاری لغزشوں پر
ستاری کرتا رہوں گا (اور اُن کو چھپاتا رہونگا)
میری عزّت کی قسم اور میرے جلال کی قسم
میں تمھیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے
رُسوا اور فضیحت نہ کرونگا۔ بس اب بخشے
بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے
راضی کردیا اور میں تم سے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجر وثواب کو دیکھ کر جو اس اُمّت کو افطار
کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

হাদীস-৪ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন—তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে বেহেশতকে অপূর্ব খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া হয়। বছরের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উহাকে রমযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়। যখন রমযানের প্রথম রাত্রি হয় তখন আরশের তলদেশ হইতে 'মুসীরাহ' নামক এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হয়। যাহার দোলায় বেহেশতের বৃক্ষলতার পাতা–পল্লব ও দরজার কড়াসমূহ দুলিতে থাকে। যদ্দ্বারা এমন এক মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সুর সৃষ্টি হয় যে, কোন শ্রোতা ইতিপূর্বে এইরূপ সুমধুর সুর কখনও শ্রবণ করে নাই। তখন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ নিজ নিজ প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে, এমন কেউ আছে কি? যে আমাদেরকে পাইবার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদিগকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। অতঃপর ঐ হুরগণ বেহেশতের দারোগা রেদওয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, ইহা কোন্ রাত্রি? রেদওয়ান লাব্বাইক বলিয়া জওয়াব দেন যে, ইহা

রমযানের প্রথম রাত্রি। আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা রেদওয়ানকে বলেন, বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দাও এবং দোযখের দারোগা মালেককে বলেন, আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযাদার উম্মতের জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দাও। জিবরাঈল (আঃ)কে হুকুম করেন, জমিনের বুকে যাও এবং পাপিষ্ঠ শয়তানদিগকে বন্দী কর এবং গলায় বেড়ী পরাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। যাহাতে আমার মাহবুব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের রোযা নষ্ট করিতে না পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক রাত্রে একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম করেন, যেন তিনবার এই ঘোষণা দেয় যে, আছে কোন প্রার্থনাকারী? যাহাকে আমি দান করিব। আছে কোন তওবাকারী? যাহার তওবা আমি কবূল করিব। আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী? যাহাকে আমি ক্ষমা করিব। কে আছে, যে করজ দিবে এমন ধনবানকে, যে নিঃস্ব নয়, যে পরিপূর্ণরূপে করজ পরিশোধ করিয়া দেয় এবং বিন্দুমাত্রও কমি করে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশ লক্ষ লোককে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করেন যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর যখন রমযানের শেষ দিন আসে তখন পহেলা রমযান হইতে শেষ পর্যন্ত যত লোক জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়াছে তাহাদের সকলের সমপরিমাণ লোককে একদিনে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা কদরের রাত্রিতে জিবরাঈল (আঃ)কে হুকুম করেন, তিনি ফেরেশতাদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া জমিনে অবতরণ করেন। তাহাদের সহিত সবুজ ঝাণ্ডা থাকে, যাহা কাবা শরীফের উপর স্থাপন করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর একশত ডানার মধ্যে সেই রাত্রে মাত্র দুইটি ডানা প্রসারিত করেন যাহা পূর্ব পশ্চিমকে ঘিরিয়া ফেলে। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণকে হুকুম করেন—তাহারা যেন আজ রাত্রে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া যিকির কিংবা নামায রত প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করেন, তাহাদের সহিত মুসাফাহা করেন এবং তাহাদের দোয়ার সহিত আমীন আমীন বলিতে থাকেন। সকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। সকাল বেলা হযরত জিবরাঈল (আঃ) সকলকে ডাকিয়া বলেন, হে ফেরেশতাগণ! এইবার সকলেই ফিরিয়া চল। তখন

ফেরেশতাগণ হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তায়ালা আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জরুরত ও প্রয়োজন সম্পর্কে কি ফয়সালা করিয়াছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং চার ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই চার ব্যক্তি কাহারা? এরশাদ হইল, প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মদ পান করে। দ্বিতীয় মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। তৃতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। চতুর্থ বিদ্বেষ পোষণকারী, যে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত্র হয় তখন আসমানে উহাকে পুরস্কারের রাত্র বলিয়া নামকরণ করা হয়। ঈদের দিন সকালে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে প্রত্যেক শহরে পাঠাইয়া দেন। তাহারা জমিনে অবতরণ করিয়া সমস্ত অলিগলি ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া যান এবং এমন আওয়াজে যাহা জিন ও মানব ব্যতীত সকল মখলুকই শুনিতে পায়—ডাকিতে থাকেন যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত! পরম দয়াময় পরওয়ারদিগারের দরবারে চল। যিনি অপরিসীম দাতা ও বড় হইতে বড় অপরাধ ক্ষমাকারী। অতঃপর লোকেরা যখন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হয় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, যে মজদুর তাহার কাজ পুরা করিয়াছে সে উহার বিনিময়ে কি পাইতে পারে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের মাবূদ আমাদের মালিক! তাহার বিনিময় ইহাই যে, তাহাকে পুরাপুরি পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাহাদিগকে রমযানের রোযা ও তারাবীর বদলায় আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করিলাম। অতঃপর বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আমার বান্দারা! আমার কাছে চাও। আমার ইয্যত ও বুযুর্গীর কসম, আজকের দিনে ঈদের এই জামাআতে তোমরা আখেরাতের ব্যাপারে যাহা কিছু চাহিবে আমি দান করিব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যাহা চাহিবে উহাতে তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গলজনক হইবে তাহাই দান করিব। আমার ইয্যতের কসম! যতক্ষণ তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ততক্ষণ আমি তোমাদের অপরাধসমূহ গোপন করিতে থাকিব। আমার ইযযত ও বুযুর্গীর কসম! আমি তোমাদিগকে অপরাধী (অর্থাৎ কাফের)দের সম্মুখে লজ্জিত করিব না। সুতরাং তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমরা আমাকে

রাজী করিয়াছ, আমিও তোমাদের প্রতি রাজী হইয়া গেলাম। ফেরেশতাগণ ঈদের দিন উম্মতের এই আজর ও সওয়াবকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। (তারগীব ঃ বাইহাকী) (হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া নিন, আমীন)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের অধিকাংশ বিষয় কিতাবের বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, বেশ কিছু মাহরূম লোক রমযানের সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ পড়িয়াছিল, যেমন পূর্বের হাদীস দ্বারা জানা গিয়াছে। আবার তাহাদিগকে ঈদের এই ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে আত্মকলহকারী ও মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানও রহিয়াছে। তাহাদেরকে কেহ জিজ্ঞাসা করুক যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোমরা নিজের জন্য কোন্ ঠিকানা তালাশ করিয়া লইয়াছ? আফসোস তোমাদের উপর এবং তোমাদের সেই মান-সম্মানের উপর, যাহা হাসিল করিবার অবাস্তব খেয়ালে তোমরা আল্লাহর রাসূলের বদদোয়া মাথায় লইতেছ। জিবরাঈল (আঃ)এর বদদোয়া বহন করিতেছ। আল্লাহর ব্যাপক রহমত ও সাধারণ ক্ষমা হইতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আজ না হয় তোমরা নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াই দিলে আর নিজের গোঁফ উঁচা করিয়াই লইলে কিন্তু ইহা কতদিন থাকিবে? কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের প্রতি লানত করিতেছেন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা তোমাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করিতেছেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও মাগফিরাত হইতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করিয়া দিতেছেন। অতএব, একটু চিন্তা কর এবং ক্ষান্ত হও। এখনও সময় আছে ক্ষতিপূরণ সম্ভব। সকালের পথহারা পথিক বিকালে ঘরে পৌছিয়া গেলে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু কাল যখন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে তোমাকে হাজিরি দিতে হইবে তখন মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই কাজে আসিবে না। সেখানে শুধু তোমার আমলেরই মূল্য হইবে। তোমার প্রত্যেকটি কাজ সেখানে লিখিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিজের হকসমূহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট হইলে উহার বদলা না দেওয়াইয়া ছাড়িবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল লইয়া উঠিবে ; নামায,

রোযা, সদকা সব নেক আমলই তাহার সাথে থাকিবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও বা অপবাদ দিয়াছিল, অথবা কাহাকেও মারপিট করিয়াছিল। তখন এই সকল দাবীদারগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী তাহার নেক আমলসমূহ হইতে উসুল করিয়া লইয়া যাইবে। এইভাবে যখন তাহার সমস্ত নেক আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন দাবীদারগণ নিজেদের গোনাহসমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া যাইবে। তখন সে এই সমস্ত গোনাহ মাথায় লইয়া জাহান্নামে চালিয়া যাইবে। বিশাল নেক আমলের অধিকারী হইয়াও তখন তাহার যে দুঃখজনক পরিণতি হইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وہ مایوسِ تمنّا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے
کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے

অর্থাৎ, জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের পরিশ্রমকে পণ্ড হইতে দেখিয়া হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আকাশ পানে চাহিবে না তো কি করিবে?

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, এই কিতাবে গোনা-মাফীর কয়েকটি স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু বিষয় আছে, যাহা গোনা-মাফীর কারণ হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, একবার যখন গোনাহ মাফ হইয়া যায় তখন পুনরায় আবার গোনাহ মাফ হওয়ার অর্থ কি? ইহার জওয়াব এই যে, মাগফেরাত ও গোনা-মাফীর নিয়ম হইল, আল্লাহর মাগফেরাত যখন বান্দার প্রতি রুজু হয় তখন তাহার কোন গোনাহ থাকিলে উহাকে মিটাইয়া দেয়। আর যদি কোন গোনাহ না থাকে তবে সেই পরিমাণ আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিষয় হইল, উপরোক্ত হাদীসে এবং পূর্বে উল্লেখিত হাদীসগুলির মধ্যেও কয়েক জায়গায় এই কথা আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ক্ষমা করার সময় ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, কিয়ামতের আদালতের বিষয়গুলি নিয়মনীতির উপর রাখা হইয়াছে। নবীদের নিকট হইতে তাহাদের তবলীগের ব্যাপারেও সাক্ষী তলব করা হইবে। বহু হাদীসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমার ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং আমি যে পৌঁছাইয়াছি, সে বিষয়ে তোমরা সাক্ষী থাকিও।

বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন

হযরত নূহ (আঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি কি নবুওয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন? আমার হুকুম আহকাম পৌঁছাইয়াছিলেন? তিনি আরজ করিবেন, হাঁ, পৌঁছাইয়াছিলাম। অতঃপর তাঁহার উম্মতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তিনি কি হুকুম-আহকাম পৌঁছাইয়াছিলেন? তাহার উম্মত বলিবে مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ

অর্থ ঃ আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে, না কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসিয়াছে। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১৯)

তখন হযরত নূহ (আঃ)কে বলা হইবে, আপনার সাক্ষী পেশ করুন। তিনি তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার উম্মতকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করিবেন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে ডাকা হইবে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে জেরা করা হইবে এবং বলা হইবে যে, নূহ (আঃ) তাহার উম্মতকে আহকাম পৌঁছাইয়াছেন তাহা তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন উম্মতে মুহাম্মদী আরজ করিবে যে, আমাদের রাসূল এই খবর দিয়াছেন ; আমাদের নবীর উপর যে সত্য কিতাব নাযিল হইয়াছিল উহাতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে অন্যান্য নবীর উম্মতের সঙ্গেও এরূপ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

অর্থ ঃ এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী উম্মতরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হইতে পার।

(সূরা বাকারাহ, আয়াত ঃ ১৪৩)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন চার প্রকার সাক্ষী হইবে ঃ

প্রথম সাক্ষী ফেরেশতাগণ, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আলোচনা করা হইয়াছে—

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

(সূরা ইনফিতার, আয়াত ঃ ৯০)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ٥ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ٥

(সূরা ক্বাফ, আয়াত ঃ ১৮/২১)

দ্বিতীয় সাক্ষী আম্বিয়ায়ে কেরাম, যাহাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে

এরশাদ হইয়াছে— وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ

(সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১১৭)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৪১)

তৃতীয় সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মদী। যাহাদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে—

وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ

(সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৬৯)

চতুর্থ সাক্ষী মানুষের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

(সূরা নূর, আয়াত ঃ ২৪)

(সূরা ইয়াছীন, আয়াত ঃ ৬৫) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

সংক্ষেপকরণের উদ্দেশ্যে তরজমা লেখা হইল না। তবে সারকথা হইল, আয়াতের শুরুতে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে কেয়ামতের দিন তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ বিষয় হইল এই হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, 'আমি কাফেরদের সম্মুখে তোমাদিগকে লজ্জিত করিব না।' ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অসীম দয়া ও অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের অবস্থার উপর তাঁহার গায়রত যে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাহাদের গোনাহ কিয়ামত দিবসেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং গোপন করিয়া রাখা হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক একজন মুমিনকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিবেন, যাহাতে আর কেহ দেখিতে না পায়। অতঃপর তাহার যাবতীয় অন্যায় অপরাধ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি লইবেন। সে তখন নিজের গোনাহের বিশাল স্তূপ এবং নিজের স্বীকারোক্তির কথা চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে যে, আমার ধ্বংসের সময় অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তখন এরশাদ হইবে, আমি দুনিয়াতেও তোমার অপরাধ গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আজ এখানেও সেইগুলি গোপন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর তাহার নেক আমলের দপ্তর তাহাকে দিয়া দেওয়া হইবে।

এইরূপ আরও অসংখ্য রেওয়ায়াত দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়

যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশকারী এবং পাবন্দির সহিত তাঁহার হুকুম-আহকাম পালনকারীর গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত এই বিষয়টি বুঝিয়া লওয়া উচিত, যাহারা আল্লাহওয়ালাদের কোন ভুল-ত্রুটির কারণে তাহাদের গীবতে লিপ্ত হইয়া যায় তাহারা যেন এই বিষয়টি মনে রাখে যে, হয়ত কিয়ামতের দিন নেক আমলসমূহের বরকতে তাহাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে আর তোমাদের আমলনামা গীবতের দপ্তর হইয়া নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করিয়া আমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন।

পঞ্চম যে জরুরী বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল, ঈদের রাত্রটিকে পুরস্কারের রাত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। এই রাত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই এই রাত্রিরও বিশেষ কদর করা উচিত। সাধারণ লোক তো দূরের কথা অনেক খাছ লোকও রমযানের ক্লান্তির পর সেই রাত্রে সুখের নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়ে। অথচ ইহাও বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার রাত্র। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া এবাদতে মগ্ন হইবে, তাহার অন্তর সেইদিন মরিবে না যেদিন সকল অন্তর মরিয়া যাইবে। অর্থাৎ, ফেৎনা-ফাসাদের সময় যখন মানুষের অন্তরের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা ছাইয়া যাইবে তখন তাহার অন্তর সতেজ ও জিন্দা থাকিবে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, এই দিনের দ্বারা শিংগায় ফুৎকারের দিনকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, সেই দিন সকল আত্মা বেহুঁশ হইলেও তাহার আত্মা বেহুঁশ হইবে না।

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি এবাদতের উদ্দেশ্যে পাঁচটি রাত্র জাগ্রত থাকিবে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। সেই রাত্রগুলি হইল—যিলহজ্জের আট, নয় ও দশ তারিখের রাত্র, ঈদুল ফিতির ও পনরই শাবানের রাত্র।

ফুকাহায়ে কেরামও দুই ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকাকে সুন্নত লিখিয়াছেন। 'মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ' কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)এর অভিমত লেখা হইয়াছে যে, পাঁচটি রাত্রে দোয়া কবূল হয়। জুমআর রাত্রে, দুই ঈদের রাত্রে, রজবের প্রথম রাত্রে এবং শাবানের পনর তারিখ অর্থাৎ শবে বরাতে।

তাম্বীহ ঃ কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, রমযান মাসে জুমআর রাত্রগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা উচিত। কেননা জুমআর দিন ও উহার রাত্রটি খুবই বরকতময়। হাদীস শরীফেও উহার বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে শুধু জুমআর রাত্রকে এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে নিষিদ্ধতাও বর্ণিত আছে। তাই উত্তম হইল, উহার সহিত আরও এক দুই রাত্র মিলাইয়া লওয়া।

পরিশেষে পাঠকদের খেদমতে আবেদন এই যে, রমযানের বিশেষ সময়গুলিতে আপনারা যখন নিজেদের জন্য দোয়া করিবেন তখন এই অধম গোনাহগারকেও আপনাদের দোয়ায় শামিল করিয়া লইবেন। হইতে পারে পরম দয়ালু মাওলা পাক আপনাদের এখলাসপূর্ণ দোয়ার বরকতে আমাকেও আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত দ্বারা আপ্লুত করিবেন।

مُنَاجَات

گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں پر ترے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں
کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے
کشمکش سے ناامیدی کی ہوا ہوں میں تباہ دیکھ مت میرے عمل، کر لطف پر اپنے نگاہ
یارب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے
چرخِ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحرِ الم چار سُو ہے فوجِ غم، کر جلد اب بہرِ کرم
کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے
ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زُہد کا ہے زاھدوں کے واسطے
ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے
نَے فقیری چاہتا ہوں، نَے امیری کی طلب نَے عبادت نَے ورع نَے خواہشِ علم و اَدب
دردِ دل، پر چاہیئے مجھ کو خدا کے واسطے
عقل و ہوش و فکر اور نعمائے دنیا بے شمار کی عطا تُو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار
بخش وہ نعمت جو کام آئے سدا کے واسطے
حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا کر مری امداد اللہ، وقت ہے امداد کا
اپنے لطف و رحمتِ بے انتہا کے واسطے

گو میں ہوں اِک بندۂ عاصی غلامِ پُر قصور جُرم میرا حوصلہ ہے، نام ہے تیرا غفور
تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے ربِّ شکور اَنْتَ شَافٍ اَنْتَ كَافٍ فِيْ مُهِمَّاتِ الْاُمُوْرِ
اَنْتَ حَسْبِيْ اَنْتَ رَبِّيْ اَنْتَ لِيْ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

'হে সারা জাহানের বাদশাহ! আমি যদিও বদকার ও নালায়েক ; কিন্তু তুমিই বল, তোমার দরজা ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়? আমি অসহায়ের জন্য তুমি ছাড়া আর কে আছে।

হে আমার রব! নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। আমার আমল তুমি দেখিও না। আমার উপর দয়া, দান ও অনুগ্রহের জন্য তোমার রহমতের প্রতি দৃষ্টি কর।

মাথার উপর গোনাহের আসমান, পায়ের নীচে দুঃখের সাগর, চারদিকে দুশ্চিন্তার সৈনিক দল। এখন দয়া করিয়া অতি শীঘ্র এই বিপদগ্রস্তের নাজাতের কোন ব্যবস্থা করিয়া দাও।

এবাদতকারীদের জন্য এবাদতের ভরসা রহিয়াছে এবং যাহেদগণের জন্য যুহ্দের ভরসা রহিয়াছে। আর আমি হাত-পাবিহীন পঙ্গুর লাঠি হইল শুধু আহ্ ও আফসোস।

ফকীরি চাই না, আমীরি চাই না, এবাদত চাই না, পরহেজগারী চাই না এবং এলেম ও আদবের খাহেশও আমার নাই। আমি চাই শুধু আল্লাহর জন্য অন্তরের দরদ ও জ্বালা।

বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা আরও অসংখ্য পার্থিব নেয়ামত তুমি আমাকে দিয়াছ। এখন হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে ঐ নেয়ামত দান কর যাহা চিরকালের জন্য কাজে আসে।

আমি হতভাগ্যের দুরবস্থা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ! তোমার অসীম দয়া ও মেহেরবানীর দোহাই—সাহায্যের সময় আসিয়া গিয়াছে ; আমাকে সাহায্য কর।

হে মহান প্রতিদানকারী! যদিও আমি গোনাহগার বান্দা, দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ গোলাম ; অপরাধ করা আমার দুঃসাহস কিন্তু তোমার নাম গাফুর ; যেমনই হই না কেন আমি তো তোমারই। তুমি আরোগ্য দানকারী, তুমি যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি আমার রব, তুমি আমার জন্য কতই না উত্তম সাহায্যকারী।'

মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী
মাজাহিরে উলূম, সাহারানপুর
২৭শে রমযান রাত্র ১৩৪৯ হিঃ

পাঁচ কা
ওয়াহেদ এলাজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ভূমিকা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ)এর বিশেষ অনুরাগ ও গভীর আগ্রহে এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে উম্মতের তাওয়াজ্জুহ, বরকত ও সক্রিয় চেষ্টা-সাধনায় কিছুকাল যাবত দ্বীনের তবলীগ ও ইসলাম প্রচারের কাজ বিশেষ নিয়মে একাধারে চলিয়া আসিতেছে, যাহা সম্পর্কে সচেতন মহল ভালভাবে অবগত আছেন।

আমার মত বে-এলেম ও গোনাহগারের প্রতি ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের হুকুম হইয়াছে যে, তবলীগের এই পদ্ধতি এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে বিষয়টি বুঝিতে ও বুঝাইতে সহজ হয় এবং উপকারিতাও ব্যাপক হইয়া যায়।

নির্দেশ পালনার্থে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যাহা ঐ সমস্ত নেক ব্যক্তিবর্গের এলেম ও জ্ঞান সমুদ্রের কয়েকটি ফোঁটা মাত্র এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর ঐ বাগানের কয়েকটি গুচ্ছ মাত্র যাহা অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে। যদি ইহাতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে ইহা আমার দুর্বল লেখনী ও অজ্ঞতার কারণে হইয়াছে। মেহেরবানী ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে উহা সংশোধন করিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমার বদ আমল ও গোনাহসমূহ গোপন রাখুন এবং আমাকে ও আপনাদিগকে ঐ সকল নেক ব্যক্তিবর্গের ওসীলায় নেক আমল ও নেক আখলাকের তওফীক দান করুন, আপন সন্তুষ্টি ও মহব্বত এবং তাঁহার মনোনীত দ্বীনের প্রচার ও তাঁহার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণের তওফীক দান করিয়া সম্মানিত করুন, আমীন।

আরজ-গুজার
বুযুর্গানের পদধুলি
মুহাম্মদ এহ্‌তেশামুল হাসান
১৮ রবীউসসানী ঃ ১৩৫৮

মাদরাসা কাশিফুল-উলূম
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া
দিল্লী (ভারত)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الأولين والأخرين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين -

আজ হইতে প্রায় সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে দুনিয়া যখন কুফর ও গোমরাহী, মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন মক্কার প্রস্তরময় পর্বতমালা হইতে সত্য ও হেদায়াতের চন্দ্র উদিত হয় এবং পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ—এক কথায় দুনিয়ার সকল প্রান্তকে স্বীয় নূর দ্বারা আলোকিত করে এবং তেইশ বছরের সময়ের মধ্যে মানবজাতিকে উন্নতির ঐ স্তরে পৌছাইয়া দেয়, যাহার নজীর পেশ করিতে গোটা জগতের ইতিহাস অক্ষম। সত্য, হেদায়াত, কল্যাণ ও কামিয়াবীর এমনি মশাল মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেয় যাহার আলোতে মুসলমানগণ উন্নতির রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শত শত বৎসর ধরিয়া এমন জাঁকজমকের সহিত দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করে যে, সকল বিরোধী শক্তিকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ইহা একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি পুরাতন কাহিনী যাহার বারবার আলোচনা না সান্ত্বনাদায়ক, আর না কোনরূপ উপকারী ও লাভজনক। কারণ বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলী স্বয়ং আমাদের অতীত ইতিহাস ও আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কৃতিত্বের উপর কলঙ্কের দাগ লাগাইতেছে।

মুসলমানদের তের শত বৎসরের জীবনকে যখন ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় তখন জানা যায় যে, আমরা ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব, শান ও শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির একমাত্র মালিক ও একচ্ছত্র অধিকারী ছিলাম। কিন্তু যখন ইতিহাসের পাতা হইতে নজর সরাইয়া বর্তমান অবস্থার উপর

দৃষ্টিপাত করা হয় তখন আমাদিগকে চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত জাতি হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। না আছে শক্তি–সামর্থ্য, না আছে ধন–দৌলত, না আছে শান-শওকত, না আছে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালবাসা, না স্বভাব ভাল, না আখলাক ভাল, না আমল ভাল, না আচার–আচরণ ভাল—সব ধরনের অকল্যাণ আমাদের মধ্যে, সব ধরনের কল্যাণ হইতে আমরা বহু দূরে। বিধর্মীরা আমাদের এই দুরবস্থার উপর আনন্দ বোধ করে, প্রকাশ্যে আমাদের দুর্নাম গাওয়া হয় এবং আমাদেরকে লইয়া উপহাস করা হয়।

এখানেই শেষ নয় বরং স্বয়ং আমাদের কলিজার টুকরা নব্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত যুবকগণ ইসলামের পূত–পবিত্র বিধানসমূহকে উপহাস করে। কথায় কথায় দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং এই পবিত্র শরীয়তকে আমলের অযোগ্য, অনর্থক ও বেকার মনে করে। অবাক হইতে হয় যে জাতি একদা পিপাসা মিটাইয়াছে, আজ তাহারা কেন পিপাসার্ত! যে জাতি দুনিয়াকে সভ্যতা ও সামাজিকতার সবক পড়াইয়াছে আজ তাহারা কেন অসামাজিক ও অসভ্য?

জাতির দিশারীগণ আজ হইতে অনেক আগেই আমাদের দুরবস্থাকে অনুধাবন করিয়াছেন এবং নানাভাবে আমাদের সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু (কবির ভাষায়)—

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

"চিকিৎসা যতই করা হইল রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।"

বর্তমান অবস্থা যখন অধিকতর শোচনীয় পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অতীতের তুলনায় ভবিষ্যত আরও বেশী বিপজ্জনক ও অন্ধকারময় দেখা যাইতেছে তখন আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এবং সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করা এক অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আমাদিগকে অবশ্যই ঐ সকল কারণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে, যে সকল কারণে আমরা এই অপমান ও লাঞ্ছনার আজাবে পতিত হইয়াছি। আমাদের এই অবনতি ও অধঃপতনের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয় এবং উহা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ অনুপযোগী ও বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে আমাদের পথপ্রদর্শকগণকেও নৈরাশ্য ও হতাশায় নিমজ্জিত দেখা যাইতেছে।

বাস্তব সত্য হইল এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের রোগ নির্ণয়ই

সঠিকরূপে হয় নাই। যে সমস্ত কারণ বর্ণনা করা হয় উহা প্রকৃত রোগ নহে বরং রোগের উপসর্গ মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত রোগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া না হইবে এবং রোগের মূল উৎসের সংশোধন ও চিকিৎসা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপসর্গের সংশোধন ও চিকিৎসা অসম্ভব ও অবাস্তব। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত রোগের সঠিক নির্ণয় ও উহার সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানিয়া না লইব ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের ব্যাপারে আমাদের মতামত ব্যক্ত করা মারাত্মক ভুল হইবে।

আমাদের দাবী হইল, আমাদের শরীয়ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ খোদায়ী বিধান, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কামিয়াবীর জিম্মাদার। অতএব কোন কারণ নাই যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের রোগ নির্ণয় করিব এবং নিজেরাই উহার চিকিৎসা শুরু করিয়া দিব। বরং আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, কুরআনে হাকীম হইতে আমাদের মূল রোগ নির্ণয় করি এবং হক ও হেদায়াতের মারকাজ এই কুরআন হইতেই সেই রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি জানিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করি। আর কুরআনে হাকীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্তের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান, সেহেতু কোন কারণ নাই যে, এই নাজুক পরিস্থিতিতে কুরআন আমাদের পথপ্রদর্শন করিতে অপারগ হইবে।

যমীন ও আসমানের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার সত্য ওয়াদা রহিয়াছে যে, পৃথিবীর বাদশাহী ও খেলাফত মুমিন বান্দাদের জন্য।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ (نور-ع۷)

اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے کہ اُن کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, অবশ্যই তাহাদিগকে যমীনের খলীফা বানাইবেন। (নূর, আয়াত-৫৫)

আর ইহাও সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, মুমিনগণ সর্বদা কাফেরদের উপর বিজয়ী থাকিবে এবং কাফেরদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে—

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (فتح ع۳)

اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے۔ پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔

অর্থ ঃ আর যদি এই কাফেররা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে অবশ্যই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত এবং তাহারা কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইত না। (ফাত্‌হ, আয়াত-২২)

আর মুমিনদের মদদ ও সাহায্য আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় রহিয়াছে এবং তাহারাই সর্বদা উন্নত শির ও মর্যাদাশীল থাকিবে।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الروم- ع٥)　　اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

অর্থঃ আর মুমিনদিগকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।(রুম, আয়াত-৪৭)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (آل عمران ع ١٤)　　اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔

অর্থ ঃ তোমরা হিম্মতহারা হইও না ; দুঃখিত হইও না, তোমরাই বিজয়ী থাকিবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও। (আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৯)

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (منافقون ع١)　　اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔

অর্থ ঃ আর ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূলের ও মুমিনদের। (মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইজ্জত, শান-শওকত, উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান এবং সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তাহাদের ঈমানী গুণাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত যদি তাহাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসূলের সহিত মজবুত থাকে (যাহা ঈমানের উদ্দেশ্য) তবে সবকিছুই তাহাদের। আর খোদা না করুন যদি এই সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা পয়দা হইয়া গিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ ধ্বংস, অপমান ও জিল্লতি রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ○ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○ (سورة عصر)　　قسم ہے زمانہ کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

অর্থ ঃ যমানার কসম! মানবজাতি বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে

রহিয়াছে ; কিন্তু যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অপরকে পাবন্দী করার উপদেশ দিতে থাকে। (সূরা আছর)

আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইজ্জত ও সম্মানের চরমে পৌছিয়াছিলেন আর আমরা অপমান ও জিল্লতীর শেষ সীমায় পৌছিয়াছি। অতএব বুঝা গেল যে, তাঁহারা পরিপূর্ণ ঈমানের গুণে গুণান্বিত ছিলেন আর আমরা এই মহান নেয়ামত হইতে বঞ্চিত। যেমন সত্য সংবাদদাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর দিয়াছেন—

سَيَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهٗ وَلَا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ۔ (مشکوٰۃ)　　یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔

অর্থ ঃ অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যে, ইসলামের শুধু নাম বাকী থাকিবে আর কুরআনের শুধু লিখিত হরফ বাকী থাকিবে। (মিশকাত)

এখন গভীরভাবে চিন্তার বিষয় এই যে, সত্যিই যদি আমরা ঐপ্রকৃত ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি যাহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পছন্দনীয় এবং যাহার সহিত আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও কামিয়াবী সম্পর্কযুক্ত। তবে কি উপায় রহিয়াছে যাহা অবলম্বন করিলে আমরা সেই হারানো নেয়ামত ফিরিয়া পাইতে পারি আর ঐ সকল কারণই বা কি? যদ্দরুন ইসলামের রূহ আমাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে আর আমরা প্রাণহীন দেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি।

যখন আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করা হয় এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের কারণ তালাশ করা হয়, তখন জানা যায় যে, এই উম্মতকে একটি অতি উঁচু ও মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল যাহার কারণে তাহাদিগকে খাইরুল উমাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মতের সম্মানজনক খেতাব দেওয়া হইয়াছে।

দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহুর যাত ও ছিফাতের পরিচয় লাভ করা। আর ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতিকে সর্বপ্রকার খারাবী ও অপবিত্রতা হইতে পাক-সাফ করিয়া যাবতীয় কল্যাণ ও গুণাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত না করা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হাজারো রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা দানের জন্য সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হইয়াছে এবং এই সুসংবাদ শুনানো হইয়াছে—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

অর্থ ঃ আজ তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করিয়া দিলাম।

(মায়েদা, আয়াত–৩)

এখন যেহেতু উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সর্বপ্রকার ভাল–মন্দ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, কাজেই রিসালত ও নবুওতের ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অতীতে যে কাজ নবী ও রাসূলগণের দ্বারা লওয়া হইতেছিল তাহা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔
(آل عمران۔ ع ۱۲)

اے اُمّتِ محمدیہ! تم افضل اُمّت ہو تم
کو لوگوں کے نفع کے لئے بھیجا گیا ہے۔
تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو
اور بُری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

অর্থ ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদী ! তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে—তোমরা সৎকাজসমূহকে মানুষের মাঝে প্রসার কর এবং অসৎ কাজ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া থাক এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। (আলি ইমরান, আয়াত–১১০)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ○ (آل عمران ع ۱۱)

اور چاہیئے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ
لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں
کا حکم کرے، اور بُری باتوں سے منع کرے
اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو
اس کام کو کرتے ہیں۔

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন জামাত থাকা চাই, যাহারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং ভাল কাজের হুকুম করে ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে—এই কাজ যাহারা করে, একমাত্র তাহারাই কামিয়াব।

(আলি ইমরান, আয়াত–১০৪)

প্রথম আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে যে, তোমরা সৎকাজের প্রসার করিয়া থাক এবং অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া থাক। দ্বিতীয় আয়াতে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, কামিয়াবী ও সফলতা একমাত্র ঐ সকল লোকদের জন্যই যাহারা এই কাজ করিতেছে।

আর শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং অন্য জায়গায় পরিস্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই কাজ না করা লা'নত ও অভিশাপের কারণ। এরশাদ হইতেছে—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ
عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ
عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا
كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○
(مائدہ۔ ع ۱۱)

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر
لعنت کی گئی تھی داؤدؑ اور عیسٰی بن مریمؑ
کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے
ہوئی کہ انھوں نے حکم کی مخالفت کی اور
حد سے نکل گئے جو بُرا کام انھوں نے کر
رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے واقعی
ان کا یہ فعل بے شک بُرا تھا۔

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর লানত করা হইয়াছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের জবানে। আর এই লানত এই কারণে করা হইল যে, তাহারা হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সীমা লংঘন করিয়াছে। যে মন্দ কাজ তাহারা করিত, উহা হইতে বিরত হইত না। তাহাদের এই কাজ নিঃসন্দেহে মন্দ ছিল।

(মায়েদা, আয়াত–৭৮, ৭৯)

নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা উপরোক্ত শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট হইয়া যায়—

(۱) وفی السنن والمسند من
حديث عبد الله بن مسعودؓ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ اِذَا عَمِلَ
الْعَامِلُ فِيْهِمْ بِالْخَطِيْئَةِ جَاءَهُ النَّاهِيْ
تَعْزِيْرًا فَقَالَ يَا هٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ فَاِذَا

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت
ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ تم سے پہلی اُمتوں میں جب کوئی
خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا
کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ
اُٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا گویا کل اس کو گناہ

كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَاٰكَلَهُ وَ
شَارَبَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلٰى خَطِيْئَةٍ
بِالْاَمْسِ فَلَمَّا رَاٰى عَزَّوَجَلَّ ذٰلِكَ
مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ عَلٰى
بَعْضٍ ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ
دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ وَالَّذِىْ
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ
عَلٰى يَدِ السَّفِيْهِ وَلَتَاْطُرُنَّ عَلَى
الْحَقِّ اَطْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ قُلُوْبَ
بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ
كَمَا لَعَنَهُمْ۔

کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب حق
عزّ وجلّ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض
کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کردیا اور
ان کے نبی داؤد اور عیسٰی بن مریم علیہما السلام
کی زبانی ان پر لعنت کی اور یہ اس لئے کہ
انھوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے
تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس
کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے تم ضرور اچھی
باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو
اور چاہیئے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو و
اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ
تمھارے قلوب کو بھی خلط ملط کردیں گے اور
پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی اُمتوں پر لعنت ہوئی۔

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি গোনাহ করিত, তখন বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি তাহাকে ধমকাইত এবং বলিত যে, আল্লাহকে ভয় কর। কিন্তু পরের দিনই সে তাহার সহিত উঠাবসা ও খাওয়া–দাওয়া করিত যেন গতকাল তাহাকে গোনাহ করিতে দেখেই নাই। যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই আচরণ দেখিলেন তখন একের অন্তরকে অপরের সহিত মিলাইয়া দিলেন এবং তাহাদের নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)এর জবানে তাহাদের উপর লা'নত করিলেন। আর ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিয়াছে এবং সীমা লংঘন করিয়াছে। ঐ পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতের হাতে মুহাম্মদের জান! তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বেওকুফ ও মূর্খ লোকের হাত ধরিয়া হক কথার উপর তাহাকে বাধ্য কর। যদি এইরূপ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরগুলিকেও একে অপরের সহিত মিলাইয়া দিবেন। ফলে তোমাদের উপরও লা'নত বর্ষিত হইবে যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর লা'নত বর্ষিত হইয়াছে।

(٢) وفی سنن ابی داؤد وابن ماجة
عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؓ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ
يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ
اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا

حضرت جریر ؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی
جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے
اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی
تو اُن پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا
عذاب بھیج دیتے ہیں یعنی دنیا ہی میں
ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کردیا جاتا ہے۔

(২) হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন দল বা কওমের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোনাহ করে এবং সেই কওম বা দলের লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বাধা প্রদান করে না ; তবে তাহাদের উপর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আজাব পাঠাইয়া দেন অর্থাৎ দুনিয়াতেই তাহাদিগকে বিভিন্ন ধরনের মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(٣) وروی الاصبهانی عن انس ؓ
اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَرُدُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ
وَالنِّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا
قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاِسْتِخْفَافُ
بِحَقِّهَا قَالَ يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِى
اللّٰهِ فَلَا يُنْكَرُ وَلَا يُغَيَّرُ۔ (ترغیب)

حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ
کلمہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اپنے پڑھنے والے کو
نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب وبلا
دُور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق
سے بے پروائی نہ برتی جائے۔ صحابہ ؓ نے
عرض کیا اس کے حقوق کی بے پروائی کیا
ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالےٰ
کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔

(৩) হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার পৌঁছাইতে থাকে এবং তাহার উপর হইতে আজাব ও বালা–মুসীবত দূর করিতে থাকে যতক্ষণ সে উহার হক আদায় হইতে গাফেল ও উদাসীন না হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ

করিলেন, উহার হক আদায়ে উদাসীনতা কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী প্রকাশ্যে হইতে থাকা সত্ত্বেও উহাকে নিষেধ না করা এবং উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা না করা।

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلَا اُجِيْبَ لَكُمْ وَتَسْاَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ (ترغيب)

حضرت عائشہ رضـ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تو میں نے چہرۂ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اُس کو سنوں حضور اقدس صـ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد وثنا کے بعد فرمایا" لوگو! اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بُری باتوں سے منع کرو مبادا وہ وقت آجائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صـ نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার নূরানী চেহারার উপর এক বিশেষ আলামত দেখিয়া অনুভব করিলাম যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও সহিত কথা বলিলেন না এবং ওজু করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। আমি মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। যেন যাহা কিছু এরশাদ করেন শুনিতে পাই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং হামদ ও ছানার পর ফরমাইলেন ঃ 'হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ তোমরা

সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ কর নতুবা ঐ সময় আসিয়া পড়িবে যে, তোমরা দোয়া করিবে আর আমি উহা কবুল করিব না, আর তোমরা আমার নিকট সওয়াল করিবে আর আমি উহা পূরণ করিব না আর তোমরা আমার নিকট সাহায্য চাহিবে আমি তোমাদের সাহায্য করিব না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই কয়টি কথা বলিলেন এবং মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন।

(٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِيَ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِيْ سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللهِ۔ (كذا فى الدر عن الحكيم الترمذى)

حضرت ابوہریرہ رضـ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری اُمت دنیا کو قابل وقعت وعظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت وہیبت اُن کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب اَمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سَبّ وشتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جلّ شانہٗ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় ও মর্যাদার উপযুক্ত মনে করিতে লাগিবে তখন ইসলামের বড়ত্ব ও মর্যাদা তাহাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর যখন পরস্পর একে অপরকে গালিগালাজ শুরু করিবে তখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহের উপর চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছাড়িয়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও গজবের কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী যখন এই কাজ ছাড়িয়া দিবে তখন তাহাদিগকে কঠিন মুসীবত, দুঃখ-যাতনা, অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে লিপ্ত করা হইবে এবং সর্বপ্রকার গায়েবী মদদ ও সাহায্য হইতে মাহরূম হইয়া যাইবে। আর এই সবকিছু এইজন্য হইবে যে, তাহারা

নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে চিনিতে পারে নাই এবং যে কাজ পুরা করা তাহাদের জিম্মাদারী ছিল সেই ব্যাপারে তাহারা গাফেল রহিয়াছে। এই কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়াকে দুর্বল ও নিস্তেজ ঈমানের আলামত বলিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ
فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ۔ (مسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে তবে সে যেন নিজের হাত দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহার শক্তি না রাখে তবে জবান দ্বারা উহাকে দূর করে, আর যদি উহারও শক্তি না রাখে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, আর উহার এই শেষ অবস্থাটি ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর।

সুতরাং শেষ অবস্থাটি যেমন ঈমানের সবচাইতে দুর্বল স্তর হইল তেমনি প্রথম অবস্থাটি পূর্ণ দাওয়াত ও পূর্ণ ঈমানের স্তর হইল।

ইহা হইতে আরো স্পষ্ট হাদীস হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِىْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ
وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ
وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (مسلم)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নীতি এই যে, প্রত্যেক নবী আপন সঙ্গী ও যোগ্য অনুসারীদের এক জামাত রাখিয়া যান। এই জামাত নবীর সুন্নতকে কায়েম রাখে, এবং যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করে, অর্থাৎ শরীয়তে ইলাহীকে নবী যে অবস্থায় এবং যেরূপে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উহাকে অবিকল হেফাজত করে এবং উহাতে সামান্যতমও পরিবর্তন আসিতে দেয় না। কিন্তু উহার পর খারাবী ও ফেতনা-ফাসাদের যমানা আসে এবং এমন লোক পয়দা হয় যাহারা নবীর তরীকা ও আদর্শ হইতে সরিয়া যায়।

তাহাদের কার্যকলাপ তাহাদের দাবীর বিপরীত হয়, তাহারা এমন সব কাজ করিয়া থাকে যাহা শরীয়তে হুকুম করা হয় নাই, সুতরাং এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হক ও সুন্নতকে কায়েম করার লক্ষ্যে নিজের হাতের দ্বারা কাজ নিল সে মুমিন, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারিল না কিন্তু জবানের দ্বারা কাজ নিল সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি ইহাও করিতে পারিল না কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস ও নিয়তের মজবুতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিল সেও মুমিন ; কিন্তু এই শেষ স্তরের পর ঈমানের আর কোন স্তর নাই—এখানেই ঈমানের সীমানা শেষ হইয়া যায়। এমনকি ইহার পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকিতে পারে না।

এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ইমাম গায্যালী (রহঃ) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 'ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ দ্বীনের এমন একটি শক্তিশালী স্তম্ভ, যাহার সহিত দ্বীনের সমস্ত কাজ সম্পর্কযুক্ত। এই কাজকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। খোদা না করুন যদি এই কাজকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ইহার এলেম ও আমলকে পরিত্যাগ করা হয় তবে নাউযুবিল্লাহ নবুওত বেকার সাব্যস্ত হইবে, সততা যাহা মানব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া যাইবে, অলসতা ব্যাপক হইয়া যাইবে, গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রশস্ত রাস্তাসমূহ খুলিয়া যাইবে, সারা দুনিয়া অজ্ঞতায় ডুবিয়া যাইবে, সমস্ত কাজ-কর্মে খারাবী আসিয়া যাইবে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ শুরু হইয়া যাইবে, সমাজ খারাপ হইয়া যাইবে, মখলুক ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস ও বরবাদী তখন বুঝে আসিবে যখন হাশরের দিন খোদায়ে পাকের সামনে হাজির হইতে হইবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

আফসোস, শত আফসোস যে আশংকা ছিল, উহাই সামনে আসিয়া গেল, আর মনে যে খটকা ছিল উহাই চোখে দেখিতে হইল—আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সেই সতেজ স্তম্ভের (দাওয়াতের) এলেম ও আমলের নিদর্শনসমূহ মিটিয়া গিয়াছে, উহার হাকীকত ও জাহেরী আমলের বরকতসমূহ খতম হইয়া গিয়াছে। অন্তরে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণা জমিয়া গিয়াছে, আল্লাহর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নফসের খাহেশাতের অনুসরণে মানুষ জীবজন্তুর মত নির্ভীক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জমিনের বুকে এইরূপ সত্যবাদী মুমিন পাওয়া শুধু কঠিন ও

দুর্লভই নহে বরং বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি হক ও সত্য প্রকাশের কারণে কাহারো তিরস্কার সহ্য করিবেন।

যদি কোন সাহসী মুমিন বান্দা এই ধ্বংস ও বরবাদীকে দূর করার এবং এই সুন্নতকে জিন্দা করার চেষ্টা করে, এই মোবারক দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং এই সুন্নতকে জিন্দা করার লক্ষ্যে হাতা গুটাইয়া ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে সকল মখলুকের মধ্যে এক বিশিষ্ট মর্যাদা ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইবে।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) যে ভাষায় এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা আমাদের সতর্ক ও সজাগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপারে আমাদের উদাসীন হওয়ার কয়েকটি কারণ বুঝে আসে।

প্রথম কারণ ঃ আমরা এই দায়িত্বকে ওলামায়ে কেরামের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি অথচ এই সম্পর্কিত কুরআনের সম্বোধনসমূহ ব্যাপক যাহা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রহঃ)দের জীবনী ইহার যথার্থ প্রমাণ।

তবলীগের দায়িত্ব এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধকে আলেমদের সহিত খাছ করিয়া নেওয়া অতঃপর তাহাদের উপর ভরসা করিয়া এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মারাত্মক অজ্ঞতা ও বোকামী। ওলামায়ে কেরামের কাজ হইল সত্যপথ বাতলাইয়া দেওয়া এবং সরল পথ দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করাইয়া নেওয়া এবং মানুষকে ঐ পথে চালানোর দায়িত্ব অন্যদের কাজ। যেমন নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে—

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى

بیشک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کئے جاؤگے پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے وہ اپنی رعیّت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے اُن کے بارے میں سوال کیا جاوے گا اور عورت اپنے خاوند کے

مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ (بخاری ومسلم)

گھر اور اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیّت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং তোমরা সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে। সুতরাং বাদশাহ জনগণের উপর জিম্মাদার—সে নিজ প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে। গৃহকর্তা তাহার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে জিম্মাদার—তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। স্ত্রী তাহার স্বামীর ঘর ও সন্তান-সন্ততির জিম্মাদার—এই সবের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। গোলাম তাহার মনিবের সম্পদের জিম্মাদার—সে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। অতএব, তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

উপরোক্ত বিষয়টিকে আরেক হাদীসে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ (مسلم)

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ (صحابہ رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا کس کے لئے۔ فرمایا اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দ্বীন হইলই হিত কামনা। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কাহার জন্য? ফরমাইলেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম তথা আমীর ও অনুসরণীয়দের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

যদি তর্কের খাতিরে মানিয়াও লওয়া হয় যে, ইহা ওলামায়ে কেরামেরই কাজ, তবুও বর্তমান সময়ের চাহিদা ইহাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই কাজে লাগিয়া যাইবে এবং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের হেফাজতের জন্য কোমর বাঁধিয়া লইবে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ আমরা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি আমরা

আমাদের ঈমানের উপর মজবুত থাকি তবে অন্যের গোমরাহী আমাদের জন্য কোন ক্ষতিকারক হইবে না। যেমন কুরআন শরীফে আসিয়াছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ
اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ
اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (مائده- ع ١٤)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم
راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے
اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔
(بیان القرآن)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিজেদের চিন্তা কর, যখন তোমরা সঠিক পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট তাহার কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। (মায়েদা ঃ আয়াত-১০৪)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অর্থ ইহা নহে যাহা বাহ্যতঃ বুঝা যাইতেছে। কেননা এইরূপ অর্থ আল্লাহ পাকের হেকমত ও শরীয়তের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। ইসলামী শরীয়ত সম্মিলিত জিন্দেগী। সম্মিলিত এসলাহ ও সম্মিলিত উন্নতিকে মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়াছে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মতকে এক দেহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে যে, এক অঙ্গ ব্যথিত হইলে উহার কারণে সমস্ত দেহ অস্থির হইয়া যায়।

আসল কথা হইল, মানবজাতি যতই উন্নতি করুক এবং উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া যাক তাহাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই থাকিবে যাহারা পথ ছাড়িয়া গোমরাহীতে লিপ্ত হইবে। অতএব, উক্ত আয়াতে মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রহিয়াছে যে, যখন তোমরা হেদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তখন ঐ সকল লোকদের কারণে তোমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই যাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

অধিকন্তু প্রকৃত হেদায়াত তো ইহাই যে, মানুষ শরীয়তে মুহাম্মদীকে উহার সমস্ত হুকুম-আহকাম সহকারে কবুল করিবে। আর আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহের মধ্য হইতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও একটি হুকুম।

আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর এই এরশাদের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন—

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رض قَالَ اَيُّهَا
النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت یاَیُّھا،

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ
فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ
اِذَا رَاَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ
اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهٖ۔

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ
مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ پیش کرتے ہو
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ
خلافِ شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں
تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان
لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرمادے۔

অর্থ ঃ হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পেশ করিতেছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাইতে শুনিয়াছি, যখন মানুষ শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখে এবং উহা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে তখন অতি সত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে স্বীয় আজাবে লিপ্ত করিবেন।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণও উক্ত আয়াতের অর্থ ইহাই করিয়াছেন। ইমাম নবভী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলিতেছেন যে, এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরামগণের সহীহ অভিমত এই যে, যখন তোমরা ঐ কাজকে পুরা করিবে যাহার প্রতি তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এখন অন্যের অপরাধ তোমাদের কোন ক্ষতি করিবে না—যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

(অর্থাৎ—কেহ অপরের বোঝা বহন করিবে না।) অতএব আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার যেহেতু আল্লাহর আদেশ করা হুকুমসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত হুকুম পুরা করিল কিন্তু নসীহত শ্রবণকারী ইহার উপর আমল করিল না—এমতাবস্থায় উপদেশদাতার উপর আল্লাহর কোন অসন্তুষ্টি নাই। কারণ সে তাহার ওয়াজিব কর্তব্য অর্থাৎ আমর-বিল মারুফ ও নাহী আনিল-মুনকার আদায় করিয়াছে; অন্যের কবুল তাহার জিম্মায় নহে।

তৃতীয় কারণ এই যে, সাধারণ ও খাছ লোক, আলেম ও জাহেল প্রত্যেকেই এসলাহ ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এখন মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব ও কঠিন ব্যাপার। যখন কাহারও সম্মুখে উম্মতের কোন

সংশোধনমূলক কর্মসূচী পেশ করা হয় তখন ইহাই জবাব পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের তরক্কী এখন কি করিয়া সম্ভব, যখন তাহাদের নিকট না আছে রাজত্ব ও বাদশাহী, না আছে মাল-দৌলত, না আছে যুদ্ধের সরঞ্জাম, না আছে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি, না আছে বাহুবল, না আছে পরস্পর ঐক্য ও একতা।

বিশেষ করিয়া দ্বীনদার শ্রেণী তো নিজেদের ধারণা মোতাবেক ইহা ফয়সালা করিয়া লইয়াছে যে, এখন চতুর্দশ শতাব্দী ; নবুওয়তের জমানা হইতে বহু দূরে, এখন মুসলমানদের অবনতি একটি অনিবার্য বিষয়। অতএব উহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক ও বেকার।

এই কথা সত্য যে, নবুওয়তের যুগ হইতে যত বেশী দূরত্ব হইবে প্রকৃত ইসলামের আলো ততই ম্লান হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার অর্থ কখনো এই নহে যে, শরীয়তকে টিকাইয়া রাখা ও দ্বীনে মোহাম্মদীর হেফাজতের জন্য কোনরূপ চেষ্টা ও মেহনত করিতে হইবে না। কেননা যদি ইহাই হইত এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও খোদা না করুন যদি ইহাই বুঝিয়া লইতেন, তবে আজ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌছিবার কোন পথ ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতি যখন বিপরীতমুখী তখন সময়ের গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বেশী হিম্মত ও মজবুতীর সহিত এই কাজকে লইয়া খাড়া হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, যে দ্বীনের ভিত্তি একমাত্র আমল ও মেহনতের উপর ছিল আজ উহার অনুসারীগণ আমল হইতে একেবারে খালি। অথচ কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন জায়গায় আমল ও মেহনতের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, একজন এবাদতকারী যে সারারাত্রি নফলে মগ্ন থাকে, দিনভর রোযা রাখে এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকিরে মশগুল থাকে সে কখনো ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে না, যে অন্যের সংশোধন ও হেদায়াতের ফিকিরে অস্থির থাকে।

কুরআনে করীম বিভিন্ন জায়গায় 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তাকীদ করিয়াছে এবং মোজাহেদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বকে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ
اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے
گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ
کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد
کریں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ

عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَّعَدَ
اللّٰهُ الْحُسْنٰى ، وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ
عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ دَرَجٰتٍ
مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ، وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (نساء ، ع ۱۳)

بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و
جان سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت
گھر بیٹھنے والوں کے ۔ اور سب سے
اللہ تعالے نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا
ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ
گھر میں بیٹھنے والوں کے اجرِ عظیم دیا ہے یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے
ملیں گے اور مغفرت اور رحمت ، اور اللہ بڑی مغفرت ، رحمت والے ہیں ۔

অর্থ ঃ যে সকল মুসলমান কোনরকম অসুবিধা ছাড়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছে, আর যাহারা নিজেদের জানমাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করিতেছে—এই উভয় দল কখনো সমান হইতে পারে না। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোককে অনেক মর্যাদাশীল করিয়াছেন, যাহারা জান-মাল দিয়া জিহাদ করে এবং সকলের জন্যই আল্লাহ তায়ালা অতি উত্তম বাসস্থানের ওয়াদা করিয়াছেন। জিহাদকারীদেরকে ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় অনেক বড় পুরস্কার দান করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা অনেক উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত হাসিল করিবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (নিসা, আয়াত-৯৫, ৯৬)

যদিও উপরোক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোকে বুঝানো হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং কুফর ও শিরক পরাজিত হয় ; কিন্তু যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা সেই মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তথাপি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া আমাদের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা ও মেহনত সম্ভব উহাতে কখনই কমি করা চাই না। আমাদের এই মামুলী চেষ্টা ও মেহনত আমাদিগকে ধীরে ধীরে আগে বাড়াইয়া দিবে।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ ঃ যাহারা আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা ও মেহনত করে আমি তাহাদের জন্য আমার পথসমূহ খুলিয়া দেই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে মোহাম্মদীকে টিকাইয়া রাখার ও হেফাজতের ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বীনের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য আমাদের আমল ও চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের খাতিরে যে পরিমাণ

অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন সেই পরিমাণ সুফলও তাহারা দেখিয়াছেন এবং গায়েবী মদদ দ্বারা তাহারা সম্মানিত হইয়াছেন। আমরাও তাহাদের নাম লইয়া থাকি—এখনো যদি আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও দ্বীনকে প্রচার করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই, তবে নিঃসন্দেহে আমরাও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও গায়েবী মদদ দ্বারা সম্মানিত হইব।

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া যাও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখিবেন।

চতুর্থ কারণ এই যে, আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেরাই যখন সঠিকভাবে আমল করি না এবং এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের উপযুক্তও নহি, কাজেই অন্যদেরকে কোন্ মুখে আমরা নসীহত করিব। এরূপ মনে করা নফসের প্রকাশ্য ধোকা। যখন একটি কাজ করিতে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমাদের প্রতি উহা করার হুকুম করা হইয়াছে তখন আমাদের জন্য এই ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া কাজ শুরু করিয়া দেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ এই চেষ্টা ও মেহনতই আমাদের পরিপক্কতা, মজবুতী ও দৃঢ়তার কারণ হইবে। এইভাবে করিতে করিতে একদিন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য নসীব হইবে। ইহা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাজে চেষ্টা ও মেহনত করিব আর তিনি রহমান ও রহীম আমাদের দিকে রহমতের নজর করিবেন না। নিম্নের হাদীস শরীফে আমার কথার প্রতি সমর্থন রহিয়াছে—

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى نَعْمَلَ بِهٖ كُلِّهٖ وَلَا نَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى نَجْتَنِبَهٗ كُلَّهٗ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَّمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ كُلِّهٖ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَّمْ تَجْتَنِبُوْهُ كُلَّهٗ - (رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط)

حضرت انس رض سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں، حضور اقدس ص نے ارشاد فرمایا. نہیں بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সৎকাজ নিজেরা পুরাপুরি পালন না করা পর্যন্ত সৎকাজের আদেশ করিব না এবং অন্যায় কাজ হইতে নিজেরা পুরাপুরি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইরূপ নহে ; বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে যদিও নিজেরা সকল প্রকার সৎকাজের পাবন্দী না করিতে পার এবং মন্দকাজে অন্যদেরকে বাধা প্রদান করিবে যদিও নিজেরা মন্দকাজ হইতে পুরাপুরি বাঁচিতে না পার।

পঞ্চম কারণ এই যে, আমরা মনে করিতেছি যে, বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি মাদ্রাসা কায়েম হওয়া, ওলামায়ে কেরামগণের ওয়াজ-নসীহত, খানকাসমূহ আবাদ হওয়া, দ্বীনী কিতাবসমূহ লেখা, বিভিন্ন দ্বীনী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ—এইসব কাজ আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের শাখাসমূহ। এইগুলি দ্বারা উক্ত দায়িত্ব আদায় হইতেছে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম থাকা ও টিকিয়া থাকা একান্ত জরুরী ; এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, দ্বীনের কমবেশী ঝলক যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা এইসব প্রতিষ্ঠানের বদৌলতেই দেখা যাইতেছে। তবুও গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এইসব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নহে এবং এইগুলিকে যথেষ্ট মনে করা আমাদের প্রকাশ্য ভুল। কেননা, এইসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমরা তখনই উপকৃত হইতে পারিব যখন আমাদের অন্তরে দ্বীনের শওক ও তলব থাকিবে এবং দ্বীনের প্রতি আমাদের ভক্তি ও আজমত থাকিবে। আজ হইতে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি শওক ও তলব ছিল। তখন ঈমানের ঝলক দেখা যাইত। এইজন্য এইসব প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজ অমুসলিম জাতিসমূহের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের ইসলামী জযবাকে একেবারে শেষ করিয়া দিয়াছে। তলব ও আগ্রহের পরিবর্তে আজ আমাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা দেখা যাইতেছে। এহেন অবস্থায় আমাদের জন্য জরুরী হইল যে, আমরা সুনির্দিষ্ট কোন মেহনত আরম্ভ করি। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের সহিত সম্পর্ক, শওক ও আগ্রহ পয়দা হয় এবং তাহাদের ঘুমন্ত জযবা পুনরায় জাগিয়া উঠে। তখন আমরা ঐ সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দ্বারা উহার শান অনুযায়ী উপকৃত হইতে পারিব। অন্যথায় এইভাবে যদি দ্বীনের প্রতি

অনিহা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা ঐগুলি টিকাইয়া রাখাও মুশকিল নজরে আসিতেছে।

ষষ্ঠ কারণ এই যে, আমরা যখন দ্বীনের দাওয়াত লইয়া অন্যদের নিকট যাই, তখন তাহারা দুর্ব্যবহার করে, কঠোর ভাষায় জবাব দেয় এবং আমাদের সহিত অপমানকর আচরণ করে।

কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই কাজ আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্ব এবং এইরূপ কষ্ট ও মুসীবতে পতিত হওয়া এই কাজের বৈশিষ্ট্য আর আম্বিয়ায়ে কেরাম এই রাস্তায় অনেক গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ (حجر ع ۱)

ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনার পূর্বে আগেকার লোকদের মধ্যে পয়গাম্বর প্রেরণ করিয়াছি এবং এমন কোন রসূল তাহাদের নিকট আসে নাই যাহার সহিত তাহারা বিদ্রূপ করে নাই। (হিজর, আয়াত-১০, ১১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'হকের দাওয়াতের রাস্তায় আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে অন্য কোন নবীকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই।'

সুতরাং উভয় জাহানের সরদার এবং আমাদের মনিব যখন এই সমস্ত মুসীবত ও কষ্ট ধৈর্যসহকারে বরদাশত করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুসারী, তাঁহারই কাজ লইয়া দাঁড়াইয়াছি, আমাদেরও এই সকল মুসীবতের কারণে পেরেশান হওয়া চাই না এবং ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করা উচিত।

উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনা হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের আসল রোগ হইল, আমাদের দ্বীনের রূহ ও হাকিকী ঈমান দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আমাদের দ্বীনী জযবা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের ঈমানী শক্তি খতম হইয়া গিয়াছে। আসল ঈমানের মধ্যেই যখন অবনতি আসিয়া গিয়াছে তখন উহার সহিত যত গুণাবলী ও কল্যাণ সম্পর্কযুক্ত ছিল সেইগুলির অবনতিও অবশ্যম্ভাবী এবং জরুরী ছিল। এই

দুর্বলতা ও অবনতির কারণ হইল ঐ আসল বস্তুকে ছাড়িয়া দেওয়া, যাহার উপর সম্পূর্ণ দ্বীনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আর উহা হইল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। আর এ কথা সত্য যে, কোন জাতি ঐ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত জাতির ব্যক্তিবর্গ সৎগুণে গুণান্বিত না হয়।

সুতরাং আমাদের রোগের চিকিৎসা ইহাই যে, আমরা তবলীগের দায়িত্ব লইয়া এমনভাবে দাঁড়াই যাহাতে আমাদের ঈমানী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইসলামী জযবা জাগিয়া উঠে, আমরা খোদা ও রাসূলকে চিনিতে পারি এবং খোদায়ী হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিতে পারি। আর ইহার জন্য আমাদিগকে ঐ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে যে পন্থা সাইয়্যিদুল আম্বিয়া হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরিকদের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب ۳)

بے شک تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھی پیروی ہے۔

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে। (আহ্‌যাব, আয়াত-২১)

এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ

لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا

অর্থ ঃ এই উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার শেষের দিকে যে সমস্ত লোক আসিবে তাহাদের সংশোধন ঐ পর্যন্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত তাহারা প্রথম যুগের সংশোধনের পন্থা গ্রহণ না করিবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের দাওয়াত লইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি একা ছিলেন, তাঁহার কোন সাথী ও সমর্থনকারী ছিল না। দুনিয়াবী কোন শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার কওমের লোকদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হক কথা শুনা এবং মানার জন্য কেহই তৈয়ার ছিল না। বিশেষতঃ যে কালেমায়ে হকের তবলীগ করার জন্য তিনি খাড়া হইয়াছিলেন সমস্ত কওমের অন্তর উহার প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণা ছিল। এহেন অবস্থায় এমন কোন্ শক্তি ছিল যাহার বদৌলতে একজন সহায় সম্বলহীন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন মানুষ কওমের সকলকে নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। এখন চিন্তা করুন—উহা কি জিনিস ছিল যাহার প্রতি

তিনি মখলুককে আহবান করিলেন। আর যে ব্যক্তি ঐ জিনিসকে পাইয়া গেল সে চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুগত হইয়া রহিল। সমগ্র দুনিয়াবাসী জানে যে, উহা শুধুমাত্র একটি ছবক ছিল, যাহা তাঁহার মূল লক্ষ্যবস্তু ও উদ্দেশ্য ছিল যাহা তিনি মানুষের সামনে পেশ করিলেন—

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ط (آلِ عمران ع ٧)

بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

অর্থ ঃ আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত না করি, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রব সাব্যস্ত না করে।

(আলি ইমরান, আয়াত-৬৪)

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর এবাদত এবং আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এক আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একটি কর্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা হইতে সরিয়া অন্যমুখী হইবে না—

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط (اعراف ع ١)

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اتباع مت کرو۔

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে, তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও অনুসরণ করিও না। (আ'রাফ, আয়াত-৩)

ইহাই ছিল ঐ আসল তালীম যাহার প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁহাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ

اے محمد! بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے اور ان

هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ (نحل ع ١٦)

کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو، بیشک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি লোকদিগকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন হেকমত ও উত্তম উপদেশের সহিত এবং তাহাদের সহিত উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব্ ঐ ব্যক্তিকে ভালভাবে জানেন, যে তাহার রাস্তা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনিই ভালভাবে জানেন যাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে। (নাহ্‌ল, আয়াত-১২৫)

আর ইহাই ছিল ঐ রাজপথ যাহা তাঁহার জন্য এবং তাঁহার অনুসারীদের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছিল—

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ط وَسُبْحٰنَ اللهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (یوسف ع ١٢)

کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

অর্থ ঃ বলিয়া দিন, ইহাই আমার পথ, আহবান করি আল্লাহর দিকে জানিয়া বুঝিয়া, আমি এবং আমার যত অনুসারী রহিয়াছে তাহারাও। আর আল্লাহ পবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(ইউসুফ, আয়াত-১০৮)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (حم سجدہ ع ٤)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

অর্থ ঃ সেই ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কাহার হইতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হা-মীম সিজদা, আয়াত-৩৩)

সুতরাং আল্লাহ পাকের দিকে তাঁহার মখলুককে ডাকা, পথহারাদিগকে সঠিক পথ দেখানো এবং গোমরাহদিগকে হেদায়াতের রাস্তা দেখানো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উদ্দেশ্য ও

প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের ক্রমবিকাশ ও উহার মূলে পানি সিঞ্চনের জন্য হাজার হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে—

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
فَاعْبُدُوْنِ ۝ (الانبياء-ع۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول
مگر اس کی جانب یہی وحی بھیجتے تھے کہ کوئی
معبود نہیں بجز میرے، پس میری بندگی کرو۔

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহার প্রতি এই ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। (আম্বিয়া, আয়াত-২৫)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনের প্রতিটি পুণ্যময় মুহূর্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর উহা হইল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহুর যাত ও ছিফাতের উপর একীন করা। ইহাই হইল ঈমান ও ইসলামের মূলকথা। আর এইজন্যই মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

অর্থ ঃ আমি জ্বিন ও ইনছানকে শুধুমাত্র এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা বান্দা হইয়া জীবন যাপন করে। (যারিয়াত, আয়াত-৫৬)

এখন যেহেতু জীবনের মাকসাদ স্পষ্ট হইয়া গেল এবং আসল রোগ ও উহার চিকিৎসার তরীকা জানা হইয়া গেল, কাজেই রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করিতে এখন আর কোন অসুবিধা হইবে না এবং এই লক্ষ্যে চিকিৎসার যে কোন তরীকাই গ্রহণ করা হইবে—ইনশাআল্লাহ উপকারী ও ফলদায়ক হইবে।

আমরা আমাদের দুর্বল জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মুসলমানদের কামিয়াবী ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি কর্ম পদ্ধতি ঠিক করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে যাহাকে ইসলামী জিন্দেগী অথবা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জিন্দেগীর নমুনা বলা যাইতে পারে। যাহার সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের খেদমতে পেশ করা হইল ঃ-

সর্বপ্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, প্রতিটি মুসলমান সর্বপ্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর কালেমা

বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার প্রসার ও খোদায়ী হুকুম-আহকামের প্রচলন ও উহাকে শক্তিশালী করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে এবং এই কথার দৃঢ় ওয়াদা করিবে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুম মান্য করিব এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবার চেষ্টা করিব। কখনই আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিব না। অতঃপর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলির উপর আমল করিবে ঃ

(১) কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঠিক উচ্চারণের সহিত মুখস্থ করা। উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝা ও অন্তরে গাঁথিয়া নেওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের পুরা জীবনকে তদনুযায়ী গড়িয়া তোলার ফিকির করা।

(২) নামাযের পাবন্দী করা এবং নামাযের আদব ও শর্তসমূহের প্রতি খেয়াল রাখিয়া খুশু-খুযুর সহিত নামায আদায় করা। নামাযের প্রতিটি রোকন আদায়ের সময় আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতার ধ্যান করা। মোটকথা, সর্বদা এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকা যেন নামায এমনভাবে আদায় হয়—যাহা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে পেশ হওয়ার উপযুক্ত হয়। এইরূপ নামাযের চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর দরবারে তওফীক চাহিবে। যদি নামাযের নিয়ম জানা না থাকে তবে উহা শিখিবে এবং নামাযে যাহা কিছু পড়া হয় তাহা মুখস্থ করিবে।

(৩) কুরআনে করীমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও আন্তরিক মহব্বত পয়দা করিতে হইবে, যাহার দুইটি তরীকা রহিয়াছে ঃ

(ক) রোজানা কিছু সময় আদব ও এহতেরামের সহিত অর্থের প্রতি ধ্যান করিয়া তেলাওয়াত করা। আলেম না হইলে এবং অর্থ বুঝিতে না পারিলে অর্থ বুঝা ছাড়াই তেলাওয়াত করিবে এবং মনে করিবে যে, আমার কামিয়াবী ও উন্নতি ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু শব্দ তেলাওয়াতও বড় সৌভাগ্য ও খায়ের-বরকতের কারণ। আর শব্দও যদি তেলাওয়াত করিতে না পারে তবে রোজানা কিছু সময় কুরআন শিক্ষার কাজে ব্যয় করা।

(খ) নিজের আওলাদ এবং মহল্লা ও এলাকার ছেলেমেয়েদের কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ফিকির করা এবং সকল ক্ষেত্রে ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া।

(৪) কিছু সময় আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরে-ফিকিরে অতিবাহিত করা। ওজীফা হিসাবে কিছু পাঠ করার জন্য সুন্নতের অনুসারী তরীকতের কোন

শায়খের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। তা না হইলে ছুওম কালেমা অর্থাৎ, সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হাম্‌দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল-আজীম, দরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়িবে। অর্থের প্রতি খেয়াল রাখিয়া ও দিল লাগাইয়া প্রত্যেকটি রোজানা সকাল-সন্ধ্যা এক তসবীহ (১০০ বার) করিয়া পাঠ করিবে। হাদীস শরীফে এই তসবীহ পাঠের বিরাট ফযীলত আসিয়াছে।

(৫) প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করা। তাহার সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির আচরণ করা। মুসলমান হওয়ার কারণে তাহার আদব ও সম্মান করা। কোন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টের কারণ হইতে পারে এমন কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পাবন্দি সহকারে নিজে পালন করিবে এবং প্রত্যেক মুসলমান ভাইও যেন উহা পালন করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করিবে। আর ইহার পন্থা হইল এই যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজেও কিছু সময় ফারেগ করিবে অন্যদেরকেও তরগীব দিয়া দ্বীনের খেদমত ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তৈয়ার করিবে।

যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস-সালাম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিভিন্ন রকম মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই কাজে নিজেদের জীবন ব্যয় করিয়াছেন এবং উহার জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান কুরবান করিয়াছেন, সেই দ্বীনের প্রচার ও হেফাজতের জন্য কিছু সময় বাহির না করা বড় দুভার্গ্য ও ক্ষতির কারণ। আর ইহাই সেই মহান দায়িত্ব যাহা ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে আজ আমরা ধ্বংস ও বরবাদ হইতেছি।

আগেকার দিনে মুসলমান হওয়ার অর্থ ইহা বুঝা হইত যে, নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু দ্বীনের প্রচার ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য কুরবান করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি এই কাজে গাফলতি করিত তাহাকে বড় নাদান মনে করা হইত। কিন্তু আফসোস যে, আজ আমরা মুসলমান হিসাবে পরিচিত এবং চোখের সামনে দ্বীনের কাজ মিটিতেছে দেখিতেছি, তবুও সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও হেফাজতের জন্য চেষ্টা করা হইতে দূরে সরিয়া থাকি। মোটকথা, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যাহা মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও আসল কাজ ছিল এবং যাহার সহিত আমাদের উভয় জাহানের কামিয়াবী

ও উন্নতি জড়িত ছিল এবং যাহা ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা লাঞ্ছিত ও বেইজ্জত হইতেছি ; এখন পুনরায় আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ কাজকে আমাদের জীবনের অঙ্গ ও আসল কাজ বানানো উচিত। যাহাতে আল্লাহর রহমত পুনরায় জোশে আসিয়া যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও সুখ নসীব হয়। ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম বাদ দিয়া শুধু এই কাজেই লাগিয়া যাইবে। বরং উদ্দেশ্য হইল, দুনিয়ার অন্যান্য জরুরত যেমন মানুষের সাথে লাগিয়াই থাকে এবং সেইগুলিকে পুরা করা হয়, তেমনি এই কাজকেও জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া ইহার জন্য সময় বাহির করা হয়। কিছু লোক যখন এই কাজের জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা নিজ মহল্লায়, মাসে তিন দিন আশ-পাশ এলাকায়, বছরে এক চিল্লা দূরবর্তী এলাকায় এই কাজ করিবে এবং চেষ্টা করিবে—ধনী হউক বা গরীব, ব্যবসায়ী হউক বা চাকুরীজীবী, জমিদার হউক বা কৃষক, আলেম হউক বা গায়ের আলেম প্রত্যেক মুসলমান যেন এই কাজে শরীক হইয়া যায় এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি পালন করিয়া চলে।

কাজ করার তরীকা ঃ কমপক্ষে দশজনের জামাত তাবলীগের জন্য বাহির হইবে। সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইবে। অতঃপর সকলেই মসজিদে জমা হইবে এবং ওজু করিয়া দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে (যদি মকরূহ ওয়াক্ত না হয়)। নামাযের পর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিবে। আল্লাহ তায়ালার মদদ, নুসরত এবং কামিয়াবী ও তওফীক চাহিবে। নিজেদের মজবুতি ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করিবে। দোয়ার পর ধীরস্থির ও শান্তভাবে যিকির করিতে করিতে রওনা হইবে এবং কোনরূপ বেহুদা কথা বলিবে না। যেখানে তবলীগ করিতে হইবে সেইখানে পৌছিয়া সকলে মিলিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং পুরা মহল্লায় বা গ্রামে গাশ্‌ত করিয়া লোকদেরকে জমা করিবে। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে নামায পড়াইবে অতঃপর উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি পাবন্দি সহকারে পালন করার ওয়াদা লইবে এবং এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার জন্য তৈয়ার করিবে। আর এই সকল লোকের সহিত তাহাদের বাড়ীর দরওয়াজায় পৌছিয়া স্ত্রীলোকদেরকেও নামায পড়াইবার ব্যবস্থা করিবে এবং এই বিষয়গুলি পালন করার জন্য তাকীদ করিবে।

যেই সকল লোক এই কাজ করার জন্য তৈয়ার হইয়া যাইবে তাহাদের একটি জামাত বানাইয়া দিবে এবং তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে

আমীর বানাইয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের দ্বারা কাজ শুরু করাইয়া দিবে এবং তাহাদের কাজের দেখাশুনা করিবে। তবলীগ করনেওয়ালা প্রত্যেক ব্যক্তি আমীরকে মানিয়া চলিবে আর আমীরের উচিত সাথীদের খেদমত করা, আরাম পৌছানো, হিম্মত বাড়ানো এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন ত্রুটি না করা এবং যে সব কাজে পরামর্শ দরকার সেই সব কাজে সকলের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া সেই অনুযায়ী আমল করা।

তবলীগের আদব

এই কাজ আল্লাহ তায়ালার এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এবং সকল নবীদের প্রতিনিধিত্ব। বস্তুতঃ কাজ যত বড় হয় সেই অনুপাতে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য অন্যকে হেদায়াত করা নহে বরং নিজের সংশোধন ও দাসত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করা ও তাঁহার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি হাসিল করা। অতএব, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়া উহার উপর আমল করা চাই ঃ

(১) নিজের সমস্ত খরচ যথা খানা-পিনা, ভাড়া ইত্যাদি যথাসম্ভব নিজে বহন করিবে। আর সম্ভব হইলে গরীব সাথীদের উপরও খরচ করিবে।

(২) নিজের সাথীদের এবং এই পবিত্র কাজ যাহারা করিতেছে তাহাদের খেদমত ও সহযোগিতাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করিবে এবং তাহাদের আদব ও সম্মান করিতে ত্রুটি করিবে না।

(৩) সাধারণ মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত আচরণ করিবে। নম্রতা ও খোশামোদের সহিত কথাবার্তা বলিবে। কোন মুসলমানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে না। বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরামকে ইজ্জত ও সম্মান করিতে কমি করিবে না। আমাদের উপর কুরআন ও হাদীসের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরাম যেমন জরুরী, তেমনি সেই সকল পবিত্র ব্যক্তিদের ইজ্জত-আজমত ও আদব-এহতেরামও আমাদের উপর জরুরী, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আপন সর্বোচ্চ নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। হক্কানী ওলামায়ে কেরামকে অসম্মান ও হেয় করা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনকে হেয় করার সমতুল্য। যাহা আল্লাহ তায়ালার নারাজী ও গজবের কারণ হয়।

(৪) অবসর সময়গুলিকে মিথ্যা, গীবত, ঝগড়া-ফাসাদ, খেল-তামাশা

ইত্যাদি মন্দ কাজে ব্যয় না করিয়া দ্বীনি কিতাবাদি পাঠে এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতে বসিয়া কাটাইবে ; ইহাতে আল্লাহ ও রাসূলের কথা জানা হইবে। বিশেষ করিয়া তবলীগের দিনগুলিতে বেহুদা কথা ও কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অবসর সময়গুলিকে আল্লাহর স্মরণ, যিকির-ফিকির, দরূদ-এস্তেগফার এবং নিজে শিখা ও অন্যকে শিখানোর কাজে ব্যয় করিবে।

(৫) জায়েয তরীকায় হালাল রুজি কামাই করিবে এবং মিতব্যয়িতার সহিত তাহা খরচ করিবে। পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শরীয়তসম্মত হক আদায় করিবে।

(৬) মতবিরোধপূর্ণ কোন মাসআলা এবং খুটিনাটি কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইবে না বরং আসল তওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং দ্বীনের আরকান তথা ফরজ বিষয়সমূহের তবলীগ করিবে।

(৭) নিজের সমস্ত কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম এখলাসের সহিত করিবে। কেননা খাঁটি নিয়ত ও এখলাসের সহিত সামান্য আমলও খায়র-বরকত ও সুফলের কারণ হয়। আর এখলাস ব্যতীত আমল না দুনিয়াতে কোন উপকারে আসে, না আখেরাতে ইহার বিনিময়ে কোন সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে। কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা আমলসমূহের মধ্যে শুধু ঐ আমলকে কবুল করিয়া থাকেন যাহা খালেছভাবে তাঁহার জন্যই করা হইয়াছে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং তোমাদের মাল-দৌলত দেখেন না বরং তোমাদের দিল এবং তোমাদের আমলকে দেখেন। কাজেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল জিনিস হইল এই কাজকে এখলাসের সাথে করা। রিয়া ও লোকদেখানো মনোভাব যেন ইহাতে না থাকে। যে পরিমাণ এখলাস থাকিবে সেই পরিমাণ কাজের মধ্যে তরক্কী ও উন্নতি হইবে।

এই মূলনীতিগুলির সংক্ষিপ্ত নকশা আপনাদের সামনে আসিয়া গিয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিবার বিষয় এই যে, বর্তমান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পেরেশানী ও

অশান্তির মধ্যে উক্ত কাজ আমাদিগকে কি পরিমাণ পথ দেখাইতে পারিবে এবং কি পরিমাণ আমাদের সমস্যা দূর করিতে পারিবে। ইহার জন্য পুনরায় আমাদিগকে কুরআনে করীমের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কুরআনে করীম আমাদের এই চেষ্টা-মেহনতকে 'লাভজনক ব্যবসা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে এবং ইহার প্রতি এইভাবে উৎসাহিত করিয়াছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ
عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ۙ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ۙ وَاُخْرٰى
تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ
قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (صف ع۲)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی سوداگری
بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے
بچالے. تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و
جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی
بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اللہ تعالےٰ
تمہارے گناہ معاف کردے گا اور تم کو ایسے
باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں
جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو
ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے. یہ بڑی
کامیابی ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس
کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی. اور آپ مؤمنین کو بشارت دے دیجئے

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে রক্ষা করিবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁহার রাসূলের উপর এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে আপন মাল ও জান দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝিতে পার। আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নীচে নহরসমূহ জারি থাকিবে। আর উত্তম বাসস্থানসমূহে যাহা চিরস্থায়ী বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে। ইহা বিরাট সাফল্য। আরও একটি জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর---উহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর আপনি (হে নবী!) মুমিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া দিন। (সূরা ছফ, আয়াত-১০-১৩)

এই আয়াতে একটি ব্যবসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার প্রথম

লাভ হইল উহা যন্ত্রণাদায়ক আজাব হইতে নাজাত দানকারী। সেই ব্যবসা এই যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং আল্লাহর রাস্তায় আপন জান-মাল দ্বারা জিহাদ করি। ইহা এমন কাজ যাহা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক ; যদি আমাদের মধ্যে সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনাও থাকিয়া থাকে। এই মামুলী কাজের বিনিময়ে আমরা কি পরিমাণ লাভবান হইব---আমাদের সমস্ত গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি একেবারে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং আখেরাতে বড় বড় নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে। এতটুকু হইলেও ইহা অনেক বড় কামিয়াবী ও মর্যাদার বিষয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুও আমাদিগকে দেওয়া হইবে। আর তাহা হইল দুনিয়ার উন্নতি, সাহায্য ও সফলতা এবং শত্রুর উপর বিজয় ও রাজত্ব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট দুইটি জিনিস চাহিয়াছেন। প্রথমটি হইল, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনি। আর দ্বিতীয়টি হইল, নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করি। ইহার বিনিময়ে তিনি আমাদেরকে দুইটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিয়াছেন। আখেরাতে জান্নাত ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি। আর দুনিয়াতে সাহায্য ও কামিয়াবী। প্রথম যে জিনিস আমাদের নিকট চাওয়া হইয়াছে উহা হইল ঈমান। আর এই কথা স্পষ্ট যে, আমাদের এই চেষ্টা-মেহনতের উদ্দেশ্যও ইহাই যে, প্রকৃত ঈমানের দৌলত আমাদের নসীব হইয়া যায়। দ্বিতীয় জিনিস যাহা আমাদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে উহা হইল জেহাদ। জেহাদের আসল যদিও কাফেরদের সহিত যুদ্ধ ও মোকাবিলা করা তথাপি জেহাদের মূল লক্ষ্য হইল আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁহার হুকুম-আহকাম পূর্ণভাবে চালু করা। আর ইহাই আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য।

অতএব বুঝা গেল যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সুন্দর ও সুখময় হওয়া এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করা যেমন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ও দ্বীনের রাস্তায় চেষ্টা-মেহনত করার উপর নির্ভরশীল, তেমনি দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করা ও দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ দ্বারা ফায়েদা হাসিল করাও ইহার উপর নির্ভরশীল যে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনি এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-মেহনতকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি।

আর যখন আমরা এই কাজকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিব অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিব এবং আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা ও মেহনত

করিয়া নিজেদেরকে নেক আমল দ্বারা গড়িয়া তুলিব তখন আমরা সারা দুনিয়ার বাদশাহী ও খেলাফতের উপযুক্ত হইতে পারিব এবং আমাদেরকে সালতানাত ও হুকুমত দেওয়া হইবে—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط (نور- ع ۷)

تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا بشرطیکہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের সহিত আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন, তাহাদিগকে জমিনে হুকুমত দান করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে হুকুমত দান করিয়াছেন। যে দ্বীনকে তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন উহাকে তাহাদের জন্য মজবুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের ভয়-ভীতিকে তিনি আমানের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। তবে শর্ত এই যে, আমার এবাদত করিতে থাকিবে এবং কাহাকেও আমার সহিত শরীক করিবে না। (নূর, আয়াত-৫৫)

এই আয়াতে পুরা উম্মতের সহিত ঈমান ও নেক আমলের উপর হুকুমত দান করার ওয়াদা করা হইয়াছে। যাহার বাস্তব প্রকাশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে শুরু করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানা পর্যন্ত একাধারে ঘটিয়াছে। যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ খোলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় ইসলামের পতাকাতলে চলিয়া আসে। পরবর্তী যমানায় একাধারে না হইলেও বিভিন্ন সময়ে নেককার বাদশাহ ও খলীফাগণের বেলায় এই ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটিতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ ○ ونحوه (بيان القرآن)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হইবে। (মায়েদা, আয়াত-৫৬)

সুতরাং জানা গেল যে, এই দুনিয়াতে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ ও ইজ্জত-সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিতে হইলে ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে, আমরা এই তরীকায় মজবুতির সহিত কাজ করিতে থাকি এবং আমাদের ইনফেরাদি ও ইজতেমায়ী সর্বপ্রকার শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেই—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران)   تم سب دین کو مضبوط پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت بنو۔

অর্থাৎ—তোমরা সকলেই দ্বীনকে মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধর ; পরস্পর খণ্ড-বিখণ্ড হইও না। (আলি-ইমরান, আয়াত-১০৩)

ইহা একটি সংক্ষিপ্ত 'নেজামে আমল' বা কর্মপদ্ধতি যাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিন্দেগী এবং আমাদের পূর্ববর্তী আদর্শবান বুযুর্গানে দ্বীনের জিন্দেগীর নমুনা। 'মেওয়াত' এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবত এই কর্মপদ্ধতির অনুসরণে মেহনত চলিতেছে। এই ভাঙ্গাচুরা মেহনতের ওসীলায় সেই এলাকাবাসী দিন দিন উন্নতি করিয়া যাইতেছে। এই কাজের বরকত ও কল্যাণ সেই এলাকায় এমনভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে, যাহা স্বচক্ষে দেখার সহিত সম্পর্ক রাখে। যদি সকল মুসলমান মিলিতভাবে এই জীবন পদ্ধতিকে এখতিয়ার করিয়া নেয় তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা এই যে, তাহাদের সকল মুসীবত ও মুশকিল দূর হইয়া যাইবে, তাহারা ইজ্জত-সম্মান ও সুখের জিন্দেগী লাভ করিবে এবং নিজেদের হারানো শান-শওকত ও মান-মর্যাদা পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইবে—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (منافقون)

অর্থ ঃ ইজ্জত শুধু আল্লাহরই এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের জন্য।

(মুনাফিকুন, আয়াত-৮)

আমি আমার উদ্দেশ্যকে যথাসাধ্য গুটাইয়া পরিস্কারভাবে পেশ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা শুধুমাত্র কতকগুলি প্রস্তাবেরই সমষ্টি নহে বরং একটি বাস্তব কাজের নকশা। যাহা আল্লাহর মকবুল বান্দা (আমার পরম শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব রহঃ) লইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই পবিত্র কাজের জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করিয়াছেন। কাজেই আপনার জন্য জরুরী হইল যে, এই সামঞ্জস্যহীন লাইন কয়টি পড়িয়া ও বুঝিয়াই যথেষ্ট মনে করিবেন না বরং এই কাজকে শিখুন, এই

পদ্ধতির বাস্তব নমুনা দেখিয়া উহা হইতে ছবক হাসিল করুন এবং নিজের জীবনকে এই ছাঁচে গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টা করুন।

শুধু এই দিকে মনোযোগী করাই আমার উদ্দেশ্য ; কাজেই এখানেই শেষ করিলাম—

پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کیلئے
میری قسمت سے الٰہی پائیں یہ رنگ قبول

অর্থ ঃ তাঁহার আঁচলে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি কিছু ফুল বাছিয়া লইয়াছি। আমার কিসমত–গুণে হে মাওলা ! উহা যেন কবুলিয়াতের সৌভাগ্য লাভ করে।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ
اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط